নিশাচর

সম্পূর্ণ উপন্যাস

সুকুমার দে সরকার

প্রাপ্তিস্থান
ঘোষ এণ্ড গুপ্ত
৩।১ রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বিভূতি সরকার, প্রকাশক
শঙ্খ-পদ্ম
১১বি, ডাক্তার রাজেন্দ্র রোড,
ভবানীপুর।

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৪৬

দাম আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য
দি নিউ প্রেস
ভবানীপুর, কলিকাতা।

হানাবাড়ী, ২৪শে এপ্রিল চুপ, দুইখুনী, দুধ সায়রের পথে, প্রভৃতি প্রণেতা, সুকুমার বাবুর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। অল্পদিনে শিশু-সাহিত্যে যাঁহারা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সুকুমার বাবু তাঁহাদের অন্যতম। রহস্য রচনায়, অদ্ভুত রোমাঞ্চকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। 'নিশাচরের' এক একটি ঘটনায় তিনি যেন বৈদ্যুতিক মুহূর্তের সৃষ্টি করিয়াছেন। বইটা আমরা শুধু পড়িয়া দেখিতে বলি।

প্রকাশক

নিশাচর—

মিটিং !
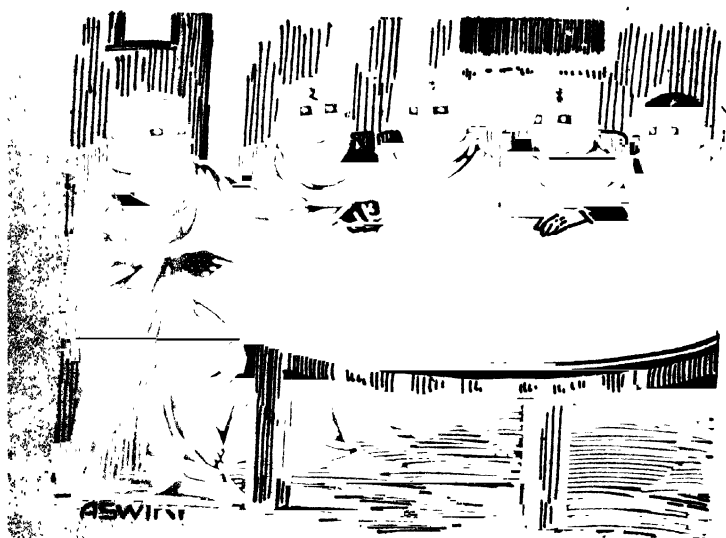
দলের আভাস

সন্ধ্যা তখনও হয়নি অথচ পৃথিবীর বুকে কালচে ধূসর একটা অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বর্ষার ছোঁয়াচ লেগে পৃথিবীর মুখ যেন গোমড়া ভারী হয়ে রয়েছে। আদি গঙ্গার ওপারে আলিপুর জেলের ক্ষেতগুলো সবুজ চকচক করছে আর এপারে বস্তীর মধ্যে নোংরা কদর্য্যতা।

বস্তীর মধ্যে টিনের চালাটার মাঝখানে বেড়া তুলে তুলে ছোট ছোট ঘর—যেন জেলের কুঠরী। তারি একটা কুঠরীতে একজন লোক কেরোসীনের ডিবে জ্বালিয়ে, একটা একপাতা খবরের কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল। কাগজটা সন্ধ্যার বিশেষ সংখ্যা।

"ই, আই, আর এ ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা।
বহু হতাহত।
কলিকাতার বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ ইন্সপেক্টার রবীন্দ্রনাথ
মুখার্জ্জীর অকাল মৃত্যু।"

পাঠক ট্রেণ দুর্ঘটনার বিবরণের দিকটা মোটেই দেখল না। কাগজের যে দিকটায় ইন্সপেক্টর রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী ছিল সেটার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

"কলিকাতাবাসী রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তিকলাপ কিছু কিছু জানেন। সামান্ত দারোগা হইতে তীক্ষবুদ্ধি বলে তিনি কলিকাতা ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের চীফ্ ইন্সপেক্টরের পদে উন্নীত হন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া গভর্মেন্ট এইবারে তাঁহাকে রায় সাহেব উপাধিতে ভূষিত করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে ইন্সপেক্টর রবীন্দ্রনাথের জন্ম প্রায় বড় রকমের চুরী ডাকাতি রাহাজানি অন্তর্হিত হইয়াছিল। সম্প্রতি একটা বড় রকমের ডাকাতি কেসে তিনি নিযুক্ত ছিলেন,—প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী জগৎমল শেঠের দোকানের রহস্তময় ডাকাতির কথা কলিকাতা বাসী জানেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৩৮। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে....."
ইত্যাদি ইত্যাদি।*

* ইন্সপেক্টর রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তিকলাপ জানতে হলে লেখকের "হানাবাড়ী" দেখুন

পাঠক— কাগজটা মুড়ে রেখে প্রকাণ্ড একটা নিঃশ্বাস ফেলে আপন মনে বলে উঠল, "যাক একটা আপদ গেল।"

লোকটার প্রায় বছর চল্লিশ, মুখে কয়েকটা কঠিনতার রেখা। এই রকম নোংরা দুরবস্থার মধ্যে বাস করলেও তার চালচলন ভাব ভঙ্গী দেখে বোঝা যায় যে সে সচ্ছলতর জীবনে অনভ্যস্ত নয়।

একটু পরে দরজায় একটা মৃদু টোকা পড়াতে লোকটা চাপা গলায় বলল—"এস খোলা আছে।"

ঘরে যে ঢুকল সেও প্রায় প্রথমোক্তের সমবয়সী, তবে তার পোষাকের পরিপাট্য খুব। এমন কি ভদ্রতা ছাড়িয়ে একটু অতিরিক্তও বলা চলে।

আগন্তুকই কথা বলল খবরের কাগজটার দিকে একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, "কি হে ধনঞ্জয়, সুখবরটা সংগ্রহ হয়ে গেছে দেখছি।"

ধনঞ্জয় একটু শ্লেষের সুরে বলল "হ্যাঁ দেখছনা সেই জন্যেই ত খালি পা শোকপ্রকাশ করছি। হাজার হোক মনিব ছিল—ছমাস শ্রীঘরও বাস করিয়েছে!"

পাঠকদের বোঝবার সুবিধার জন্য এখানে বলে রাখা ভাল যে ধনঞ্জয় রায় এক সময়ে ইন্সপেক্টর রবীন্দ্রনাথের কেরাণী ছিল। ঘুস নিয়ে কয়েকটা গুপ্ত ঘটনা প্রকাশ করায় তাকে জেলে যেতে হয়। এই মাস খানেক সে ছাড়া পেয়েছে।

আগন্তুক বলল "গিয়েছিলে ছুঁচো মারতে। আকাঙ্ক্ষা উঁচু হওয়া দরকার, সামান্য নয়। যাক তুমি কি ঠিক করলে দলে যোগ দেবে।"

"হুঁ! আর ত যোগ দেওয়ার কোন বাধা দেখিনা। তবে আমি ওসব আসল লুঠপাটের মধ্যে নেই। জেলের গরাদের ওপারটা আমি দেখে এসেছি" ধনঞ্জয়ের মুখে একটা ঘৃণা ফুটে উঠল "আমি আর সেদিকে যেতে চাইনা। আমি শুধু খবর সংগ্রহ করে দেব।"

আগন্তুক হাসল "আসল কাজে তোমাকে পাঠাচ্ছে কে? খুব এক্সপার্ট না হলে আসল কাজে যাকে তাকে আমাদের একনম্বর নামায় না। আসলে আমাদের দলটা আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য এর অরগ্যানিজেসন্! আর আমাদের একনম্বরের মাথাটা মিউজিয়ামে রেখে দেবার উপযুক্ত। এ দলে একনম্বর ছাড়া কেউ কারো নাম জানেনা। যদি কখন কেউ ধরা পড়ে সে অন্যদের নাম বলতে পারবে না। দলে সবাই একত্র হয় মুখোস মুখে দিয়ে—আর পরিচয় নম্বর দিয়ে।"

ধনঞ্জয় বলল "কিন্তু তুমিত আমার পরিচয় জান।"

"বলেছিত দলে আমরা ছদ্মবেশে মেলামেশা করি মুখে নম্বর আঁকা মুখোস। একত্র হলেও তোমায় আমি চিনবো না।"

কিন্তু [illegible] যখন একসঙ্গে কাজ করে—আচ্ছা কাজ কখন হয় ?”

“র[illegible] বেশীর ভাগ। দলের নামই হোল নিশাচর! তবে একনম্বরের মতলব এবার দিনেও হবে।”

“আচ্ছা ধর যদি দলের কোন সভ্যকে যদি কেউ ফলো করে গিয়ে পুলিশে খবর দেয় ? মানুষের প্রাইভেট ঝগড়া ত আছে।”

“হুঁ! হয় না আমি বলিনা একবার হয়েও ছিল। আমাদের দশ নম্বরের একবার ওই কুবুদ্ধি জেগেছিল। পরের দিন হুগলীর গঙ্গায় তাকে পুলিশ আবিষ্কার করে। আমাদের এক নম্বরের হাজারটা চোখ আর হাত সারা ভারতবর্ষের সমান লম্বা।”

“এক নম্বরটা কে ?”

আগন্তুক হেসে উঠল “সেটা জানতে বোধ হয় পুলিশ হাজার হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত! একনম্বর কে কেউ জানে না দলের ও কেউ নয় শুধু বোধহয় দুনম্বর ছাড়া। তবে দুনম্বর আর একনম্বরকে এক আত্মা বলা যায়! শুধু ভয় ছিল এই হতভাগা ইন্সপেক্টর রবীনকে কিন্তু সেত এখন ওপারে। কে জানে ওই ট্রেণ দুর্ঘটনায় এক নম্বরের হাত ছিল কিনা!”

ধনঞ্জয় বল্লে, “হুঁ! কিন্তু পাওয়া যাবে কেমন—

বিপদটা ত নেহাৎ কম নয়! কলকাতার [illegible] পুলিশের বিরুদ্ধে লাগা!”

আগন্তুক হেসে বলল “দলে যে [illegible] ক ভাগ সকলের সমান। শেষ ব্যাপারটায় আমি কত পেয়েছিলাম জান?”

আগন্তুক একটা সংখ্যা বলল। ধনঞ্জয় শীষ দিয়ে উঠল। “হুঁ! কিন্তু ধর আমি যদি স্পাই হই? আমি যদি সোজা পুলিশে গিয়ে খবর দিই?”

একটা বিশ্রী সুরে আগন্তুক জবাব দিল “চেষ্টা করে দেখ, কত দূর পৌঁছাও!”

“কেন আমার ওপর পাহারা বসেছে নাকি?”

“দল কি কাঁচা কাজ করে ভেবেছ? তাছাড়া ধরা গেল তুমি কোন রকমে আমাদের ফাঁকি দিয়ে পুলিশ নিয়ে এলে কিন্তু আমাকে তুমি পৃথিবীতে খুঁজে পাবে না। আমার চেহারা তখন বদলে গেছে। আমাদের পনেরো নম্বর প্লাষ্টিক সার্জ্জারীতে এক্সপার্ট।”

ধনঞ্জয় থ হয়ে গেল।

“আচ্ছা তুমিত দলের অনেক কথা আমায় বললে এখন তোমাদের দলে যোগ না দেওয়াটাকি আমার পক্ষে নিরাপদ হবে?”

“খুব! যদি না তুমি কোন রকম বাঁদরামি কর।”

“আর যদি আমি রাজী হই?”

"তা [illegible] এক বছরে তুমি লাখপতি!"

"[illegible] গরীব হওয়াটাই জীবনের সবচেয়ে বড় অপরাধ। আমি [illegible]।"

"তা হলে রাত দশটার সময়ে গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে এই নম্বরের যে ট্যাক্সি ওয়ালাটা থাকবে তাতে উঠে বোস। কিছু বলতে হবে না। তবে মনে থাকে ট্যাক্সি ওয়ালা দলের লোক নয়। সাধারণ ট্যাক্সি ওয়ালা। তাকে ভাড়া দিয়ে বলা থাকবে। সে তোমায় ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে নামিয়ে দেবে। তারপর সেখানে যা ঘটবে চুপ করে মেনে নিও। এখন থেকে বলে রাখব না। যদিও তোমাকে বিশ্বাসী মনে হচ্ছে কিন্তু দল কোন চান্স নিতে পারে না।"

যাবার আগে আগন্তুক এক তাড়া নোট ফেলে দিয়ে বলল "তোমার পোষাক পরিচ্ছদের খরচ! গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে ট্যাক্সিতে উঠছ পোষাক তেমনি হওয়া চাই।"

ধনঞ্জয় হাসল "তাছাড়া বেশীটা আগাম পাওনা কি বল?"

দুজনে হেসে উঠল।

লেজারের এক ঘা

বেলা প্রায় সাতটা বাজে। মনোহর বাবু বিছানার মধ্যে আড়ামোড়া ভেঙ্গে উঠে বসলেন। সকালটা ভারী একটা স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে আজ। গত তিন দিন ধরে শ্লেটের মত ধূসর আকাশ আর পিট পিট বৃষ্টি মানুষের মনকে দমিয়ে রেখেছিল—সেই এক একাকার কলকাতার রূপ! বড় বড় বাড়ীগুলো মাথা নীচু করে দিয়ে ভিজছে। নিরাশার সে কালো মেঘ কেটে গেছে। অকস্মাৎ মায়াময় স্নিগ্ধ সোনালী সকাল উঠেছে হেসে।

মনোহর বাবুর ঘরের জানলা দিয়ে দেবদারু গাছটার পাতাগুলো বৃষ্টিস্নাত, সতেজ সবুজ। দেবদারু গাছটা ছাড়িয়ে রেল লাইন একটা পোল পার হয়ে বাঁক নিয়েছে। এপারে কলকাতা আর ওপারে যেন ছেলে-বেলায় দেখা ছবির মত মিলিয়ে যাওয়া গাঁয়ের ছাপ। সমস্ত দিনটা তেজারতির টাকার ঝনঝনানির মধ্যে বসে, বিশ্রামটুকু মনোহর বাবুর অপরিহার্য্য। তাই

কলকাতার উপকণ্ঠে এই ছোট্ট বাড়ীটুকু তিনি করিয়েছেন, বাড়ীটার নাম দিয়েছেন শান্তি নীড়।

ঘুম ভেঙ্গেই জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে মনোহর বাবুর মনটা খুসীতে ভরে উঠল। ওই বয়সে—প্রায় চল্লিশ ছুঁয়েছে—মনোহর বাবুর মনের সে সতেজতা অনেককেই আশ্চর্য্য করে দেবে! এখনও তাঁর মনের রোমান্স রঙীন। স্বপ্ন দেখতে তিনি ভাল বাসেন—অদ্ভুত রঙীন রহস্যময় কল্পনা! আমরা জানিনা, কিন্তু জীবনে উচ্চতম দৃঢ় নায়ক, সবল নেতা ইত্যাদি হতে পারেন নি বলেই কি তিনি স্বপ্ন বিলাসী? জীবনে যারা ব্যর্থ তারাইত স্বপ্ন দেখে—দৃঢ় পায়ে যারা এগিয়ে চলেছে, স্বপ্নবিলাসের অবসর কোথায় তাদের?

মনোহর বাবুর তেজারতির কারবার—সোনারূপোর গয়না বন্ধক রেখে টাকা ধার দেওয়া, চেনাশুনো লোকেদের চটায় টাকা দেওয়া ইত্যাদি তাঁদের কাজ। বড়বাজারের দত্ত দাস এণ্ড কোং খুব বেশী দিনের কারবার না হলেও, মিষ্টি ব্যবহারে এবং সুদের হারের সহজ ব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই বেশ নাম করেছে।

মনোহর দাসকে দেখে মনে হয় যেন কবি। কিন্তু কাব্য তাঁর অন্তরূপ না পেয়ে, টাকার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মনোহর বাবু টাকায় কবি। মাথায় সাধারণ বাঙালীর মত উচ্চতা, বয়স প্রায় চল্লিশ

হলেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো তখনও ভারী হয়নি, বরং রোগাই বলা চলে, দাড়ী গোঁফ কামান—সব সময়ে একটা চঞ্চল ভাব। অনেকে যাকে নার্ভাসনেস বলে ভুল করে। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য হোল মনোহর বাবুর চোখের দৃষ্টি। চোখের তারা দুটো তাঁর ঘন কালো আর অতল। সেখানে মনের গভীরতার শেষ নেই। ওই দৃষ্টি—একবার জমে গেলে—মনে হয় সে রহস্যের শেষ পাওয়া যাবে না।

ঘড়িটাতে ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গেল।

মনোহর বাবু হাঁক দিলেন—"যদু ?"

মধ্যবয়সী একটা কালো মত চাকর ছুটে এল।

"এত দেরী কেন, যদু ? নে বাবা একটু তাড়াতাড়ি করে !"

"এই যে চা হয়ে গেছে বাবু।"

"খবরের কাগজ দিয়েছে ?"

"দেখছি।"

বয়সের অনুপাতে চা যেমন তাঁর একটা বিলাস তেমনি চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজটুকু পড়াও আর একটা। কিন্তু সেদিন খবরের কাগজের মাঝের পাতাটায় পৌঁছে মনোহর বাবুর মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল। সমস্ত পাতাটা জুড়ে বড় বড় হরফগুলোর ওপর তাঁর চোখ আটকে গেল।

কলকাতার বুকে আবার সেই অসমসাহসী ডাকাতি।

রহস্যময় দল কারা ?

পুলিশের সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্যতা।

কলিকাতাবাসীরা জানেন যে কিছুদিন যাবৎ একদল অসমসাহসী ডাকাত স্বচ্ছন্দে লুঠ করিয়া বেড়াইতেছে। প্রথমে জগৎমল শেঠের কাপড়ের দোকান লুঠ হয়। তারপরে পাট ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র লাহার সিন্দুক ভাঙ্গা যায়। পুলিশ কোন কেসেই কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারে নাই। এই দলের কার্য্যপ্রণালী যেমন আধুনিক তেমনি বিজ্ঞান-সম্মত। শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র লাহার ব্যবসায় উপলক্ষ্যে সর্ব্বদা কাঁচা টাকার প্রয়োজন হইত বলিয়া তিনি সিন্দুকে অনেক টাকা রাখিতেন। এবং সেই জন্য সিন্দুকটি তিনি অতি আধুনিক 'বার্গলার প্রুফ' করাইয়া ছিলেন। যে বিলাতী কোম্পানী সিন্দুকটা দিয়াছিল তাহারা বলিয়া দিয়াছিল সিন্দুক সম্বন্ধে উহাই শেষ কথা—সম্পূর্ণ অভেদ্য। কিন্তু সকালে আফিসে গিয়া তিনি দেখেন যে সেই অভেদ্য সিন্দুকের ডালা দলা দলা হইয়া গলিয়া পড়িয়া আছে—টাকাকড়ি সব অন্তর্হিত।

এ সব কথা আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলাম। কিন্তু গতকল্য রাত্রি নয় ঘটিকার সময় প্রসিদ্ধ দেশী অলঙ্কার ব্যবসায়ী হীরালাল ক্ষেত্রীর দোকানে যে কাণ্ড হয় তাহা

আমাদের কল্পনাকেও হার মানাইয়াছে। [illegible] মহাশয় দোকান বন্ধ করিয়া যাইবার যোগাড় করিতেছেন, এমন সময় চারজন লোক পিস্তল হস্তে তাঁহার দোকানে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া চলিয়া যায়। তাঁহার দরোয়ান বাধা দিতে গিয়া মারাত্মক আহত হইয়াছে। আততায়ীদের পিস্তলে সাইলেন্সার লাগান ছিল। এবং তাহারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে হত্যাতেও তাহারা কুণ্ঠিত নয়। কলিকাতা হইল কি ?”.........ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাগজটা মুড়ে মনোহর বাবু উঠে পড়লেন।

“যদু ! যদু !”

যদু দৌড়ে এল।

“আমাদের পাশের দোকানে কাল লুঠ হয়েছে। আমি এক্ষুনি দোকানে চললাম।”

“আচ্ছা বাবু !”

যদু মনোহর বাবুর বিশ্বাসী ভৃত্য। মনিবের প্রতিটি মনের অবস্থা সে বোঝে।

“সেই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর দল !”

কথাটা মনে হোল মনোহর বাবু যদুকে বলেন নি। যেন অনেকটা তাঁর স্বগতোক্তি।

যদু জবাব দিল ‘ও’ !

ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছটা বেজে গেল।

লেজারের ওপর ঝুঁকে পড়ে সুরজিত ভাবছিল আর একটা দিন মাটি। দিনটা সুরুও হয়েছিল চমৎকার। তিনদিন বৃষ্টির পর রৌদ্রতপ্ত একটা উজ্জ্বল দিন—তার ওপর মোহন বাগানের খেলা। সব ফস্কে গেল। বাইরের পৃথিবী কর্ম্মক্লান্ত দেহ শিথিল করে দিয়ে শ্রান্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। পৃথিবীর রঙ বদলাচ্ছে। আর সে এখনও অন্ধকার ঘরের মধ্যে খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে—এখনও হিসাব মেলেনি। টাকার রাশ আটকে আছে তার জন্য। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যেতে পারছেনা। সমস্ত দেহটা তার ব্যয়ামের অভাবে আড়ষ্ট। চাকরী নিয়ে অবধি বিকেলের মুখ সে দেখেনি। আশ পাশের ডেস্কগুলো মাঝে মাঝে খালি। কেরাণীরা বাড়ী গেছে। সুরজিত তখনও বন্দী সংখ্যার রাশির মাঝখানে। তার মাথায় আর কিছু ঢুকছে না—কিন্তু চাকরীর মায়া, জীবনের অন্ন সংগ্রহের প্রচণ্ড সমস্যা! বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে বিধবা মা আর অবিবাহিতা ভগ্নীর ভার তার ওপর। খোলা হাওয়া তাকে বাদ দিয়ে এড়িয়ে চলে।

কামরা থেকে বেরিয়ে এসে ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্টেণ্ট মিঃ দালাল হাঁক দিলেন ইংরেজীতে "বোস তুমি শেষ করেছ?"

সুরজিত হাঁফিয়ে উঠল "না স্যার! আর একটু...!"

"সারা রাত আমরা তোমার জন্তে বসে থাকতে পারি না।"

এমন সময় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন "এখনও টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যায়নি ?" ইংরিজীতে জিগেস করলেন তিনি।

অ্যাকাউন্টেন্ট জবাব দিল "মিষ্টার বোস এখনও শেষ করেন নি।"

"Fire him! অকেজো লোক দিয়ে আমাদের চলবে না।"

সুরঞ্জিত জমে গেল। বিধবা মা আর অবিবাহিতা বোন—অন্নহীন জীবনের সেই প্রচণ্ড যুদ্ধ! ঠিক সেই সময় দরজায় একটা শব্দ হোল। একজন লোক পেছন ফিরে ভেতরে ঢুকল।

ম্যানেজার গর্জ্জে উঠলেন "Hey! What do you want ?" (এই! কি চাই তোমার ?) লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। চোখের ওপর তার একটা কালো মুখোস, হাতে একটা দোনলা উগ্নত পিস্তল। মুখে হাসি।

"আর একটিও কথা নয়! হাত তুলে ফেলুন! দেখতে দেখতে বিত্যুতের মত ছটা লোক নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে এল। ম্যানেজারের হাতটা অ্যাকাউন্টেন্টের ডেস্কের টেলিফোনের ওপর নিঃশব্দে নেমে আসছিল। একটা সামান্য শব্দ হোল "প্লপ্!"

ম্যানেজার হাতটা চেপে ধরে বসে পড়লেন।

"কেউ নড়বে না। কোন বাঁদরামী নয়—প্রাণের মায়া থাকেত!"

দুটো লোক নিঃশব্দে ব্যাঙ্কের ভল্টের মধ্যে ঢুকে গেল। আর দশ মিনিট পরে বেরিয়ে এল তারা।

"বেশী কিছু নেই হাজার দশেক!"

"হুঁ!" যে লোকটা প্রথমে ঢুকেছিল সে এগিয়ে এল সুরজিতের সামনে।

"কত ব্যালান্স আজ।"

সুরজিত জোর করে মুখে হাসি টেনে আনল।

"হিসেব মিলছে না।"

"ব্যালান্স কত?"

"পাঁচ আনা চার পাইয়ের তফাৎ!"

লোকটা কিছু বলবার আগেই একটা শিষ শোনা গেল। নিমেষের মধ্যে সুরজিত লেজার খানা তুলে লোকটার মুখের উপর আঘাত করল। এক সঙ্গে ছটা বন্দুক গর্জ্জে উঠল—প্লপ্ প্লপ্ প্লপ্!

আলফা বিটা গামা। সমস্ত আকাশে অসংখ্য ফুলঝুরি। পৃথিবীটা জট পাকিয়ে গেছে।

গোলমালের মধ্যে কোথা থেকে তীব্র একটা শিষের শব্দ। তারপরে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। ম্যানেজারের গলা শোনা গেল "হ্যালো হ্যালো হ্যালো অ্যাম্বুলেন্স...... পুলিশ......খুন!

কাউণ্টারের নীচে থেকে সুরজিত বলল "টেলিফোনের তারটা কাটা !"

ম্যানেজার লাফিয়ে উঠল "আরে বোস তুমি ঠিক আছ ?"

"সম্পূর্ণ ! কিন্তু দরোয়ান গুলো কোথায় ? আর এরা কোন দল বুঝেছেন মিষ্টার গাফ্ ?"

"পড়েছি কাগজে। কিন্তু আমাদের এখনি পুলিশে খবর দেওয়া দরকার।"

সুরজিত বলল "ব্যবস্থা করছি কিন্তু আমার মনে হয় it is too late (বড় দেরী হয়ে গেছে)।"

হল থেকে বাইরে এসে তারা দেখল সামনে যে ঘরটায় তুটো দরোয়ান বন্দুক ঘাড়ে করে পাহারা দেয় সে ঘরটায় তালা মারা।

সুরজিত হাঁকল "শ্যামসিং ?"

ভেতর থেকে ক্ষীণ সাড়া এল "হজৌর, হাম লোগকে বাঁধ ডালা।"

তালা ভেঙ্গে তাদের খুলে দিয়ে অ্যাকাউণ্টেণ্টের সঙ্গে ম্যানেজারের গাড়ীতে সোজা লালবাজারে পাঠান হোল—পুলিশকে খবর দিতে। ভেতরে এসে ম্যানেজার সুরজিতকে জিগেস করলেন "তুজনে একসঙ্গে তোমাকে ফায়ার করেছিল। বাঁচলে কি করে ?"

সুরজিত হাসল "লেজারটা ডাকাতটার মুখের ওপর

২১ ... জারের এক ঘা মেরেই সঙ্গে সঙ্গে আমি কাউন্টারের নীচে ঢুকে পড়ি। আপনারওত হাতে লেগেছে।”

“সামান্য একটু ঘসে গেছে মাত্র। কিন্তু তোমার সাহস আছে বোস।”

দেখতে দেখতে আধ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশে ব্যাঙ্কটা ঘিরে ফেলল। এবং দেখতে দেখতে হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল খবর। ইন্সপেক্টর সুশীল মুখার্জ্জী জিগেস করলেন “দলটা এদেশী লোক না ইউরোপিয়ান?”

ম্যানেজারের ভ্রু দুটো উঁচুতে উঠল “আপনারা জানেন না?”

“না। কারণ এতদিন রাতেই ওরা কাজ সেরেছে। এতবড় বুকের পাটা এই প্রথম। প্রকাশ্য দিবালোকে কলকাতায় এত ধারণা করা যায় না।”

সুরজিত বল্‌ল “তারাও তাই জানত—কেউ এটা ধারণা করতে পারবে না বলেই এটা তারা ষ্টেজ করেছে।”

ম্যানেজার বল্‌লেন “আমি জানতে চাই পুলিশ এ বিষয়ে কি করবে।

“মিষ্টার গাফ্” সুশীলবাবু বল্‌লেন “বুঝতেই পারছেন এর পেছনে ব্রেণ আছে। সাধারণ ডাকাতের পক্ষে এরকম একটা ব্যাপার অর্গ্যানাইজ করা সম্ভব নয়।

পুলিশ ডিপার্টমেন্ট বসে নেই কিন্তু একটা জটিল অপরাধ ভাঙ্গতে সময় লাগে।"

ম্যানেজার মুখে একটা শব্দ করলেন "হ্যাঁ সময় যাক আর নির্দ্দোষী লোকের সর্ব্বনাশ হতে থাকুক। কলকাতা দেখছি নিউ ইয়র্ক হয়ে উঠল।"

"আপনি একটু সাহায্য করুন মিষ্টার গাফ্ আমাদের যতদূর সাধ্য করব।"

"হ্যাঃ!"

"কোন দেশী লোক ডাকাতগুলো?"

"ইণ্ডিয়ান।"

সুশীল বাবু সুরজিতের দিকে ফিরলেন "আপনি একটা লোককে লেজার দিয়ে মেরেছিলেন বললেন। লোকটা কি করল?"

"আমি দেখিনি।"

"আপনি কি করছিলেন?"

"আমি তখন কাউন্টারের নীচে, বুলেটের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাচ্ছি।"

ম্যানেজার বললেন "বোস, লেজার দিয়ে লোকটার মুখে মারতেই লোকটা ঘুরে পড়ে গেল। তার নাক দিয়ে ভলভল করে রক্ত বেরচ্ছিল। অন্য লোকগুলো আমাদের দিকে পিস্তল পয়েণ্ট করে তাকে কাঁধে তুলে বেরিয়ে গেল।"

ইন্সপেক্টর তাদের জবানবন্দী লিখে নিয়ে বাইরে এলেন। বাইরে জন্তুর মত ভিড় জমে গেছে। ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সামনে একদল পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। আফিস মহল যদিও তখন সব খালি হয়ে গেছে তবু দু' একটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দৈত্যের মত বাড়ীর এক একটা রহস্যময় কুঠুরীতে মৃদু আলোর আভাস।

ইন্সপেক্টর আশ পাশের আফিসের দরোয়ানদের কাছে প্রশ্ন করে জানলেন যে ব্যাঙ্ক থেকে যথারীতি ব্যাঙ্কের গাড়ী যায়, রাইফেলে কিরীচ লাগান বন্দুক হাতে দরোয়ান সমেত সেদিনও তেমনি গেছে।

সুরজিত বলে উঠল "কিন্তু দরোয়ানেরা তালা বন্দী ছিল। আর পিস্তল হাতে দুটো লোক তাদের পাহারা দিচ্ছিল।"

ইন্সপেক্টর হাসলেন "এরা সাধারণ ডাকাত নয় মিষ্টার বোস। নিজেদের লোককে দারোয়ান সাজিয়ে তারা নিয়ে এসেছিল।"

"কিন্তু আহত একটা লোককে তারা নিয়ে এল কেউ দেখেনি?"

"ব্যাঙ্কের সামনে হাজার হাজার গাড়ী আসে। কে আর লক্ষ্য করে বলুন? দিনের কাজ!"

"গাড়ীর নম্বর কেউ দেখেনি?"

"দেখেছে। ম্যানেজারের নিজের গাড়ী!"

মিষ্টার গাফ্ লাফিয়ে উঠলেন "আমি জানতে চাই এ বদমাইসদের সম্বন্ধে পুলিশ কি করছে ?"

শান্ত স্বরে ইন্সপেক্টর জবাব দিলেন "যতদূর সাধ্য মিষ্টার গাফ্ যতদূর সাধ্য !"

দেখতে দেখতে ট্রামের আর বাসের মোড় গুলোয় খবরের কাগজের হকারদের চীৎকারে কাণ পাতা অসম্ভব হয়ে উঠল "প্রকাশ্য দিবালোকে কলকাতার বুকে অসম সাহসী ডাকাতি। ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লুঠ।" খবরের কাগজে মিষ্টার গাফ্ আর সুরজিতের ছবি আর [illegible]নী বেরিয়ে গেল। বড় বড় হরফে সুরজিতের ডাকাতদের দলপতিকে আক্রমণের কাহিনী। এক রাত্রে সুরজিত বিখ্যাত হয়ে গেল।

সেই দিন রাত্রে সুরজিত যখন বাড়ী ফিরল তার মা বললেন "সুরো একজন তোকে ডাকতে এসেছিল।"

"আমাকে ?" সুরজিত বলল "কে ? নাম কি ?"

"নাম বলল না। খোঁজ নিচ্ছিল তোর সম্বন্ধে।"

"কি চায় ? কিছু বলে গেছে ?"

"বলেনি একটা চিঠি দিয়ে গেছে।"

সুরজিত চমকে বলল "কই ?"

মায়ের কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে সুরজিত খুলে দেখে টাইপ করা চিঠি—লাল কালীতে ওপরে লেখা।

Warning

"সাবধান। এ ব্যাপার থেকে দূরে থাক। তুমি আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে আছ।" নিশাচর

ব্যস চিঠিটার নীচে আর কোন সইটই কিছু নেই।

চিঠিটা পড়ে প্রথমটা সুরজিত হতভম্ব হয়ে গেল তারপরে ভয়ঙ্কর একটা রাগ ঘনিয়ে এল তার মনে।

রহস্যময় দল

একটা প্রশস্ত হল ঘর। ঘরে একটা সবুজ বাতী জ্বলছে। ঘরটা থেকে নীচে তাকালে একদিকে মহা নগরীর আলোক মালার রহস্য অন্যদিকে ঘন সংবদ্ধ পিঁপড়ের সহর যেন। ঘরের মধ্যে একটা কৌচ। কৌচে অর্দ্ধশায়িত ভাবে একটা লোক পড়েছিল নাকের ওপর তার একটা রুমাল চাপা। লোকটার গড়ন অত্যন্ত সাধারণ। সাধারণ বাঙ্গালীর মত তার উচ্চতা, শরীর শিথিল। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। টেবিলের ধারে ধারে অনেকগুলো চেয়ার পাতা—চেয়ারগুলোর একটাও খালি নেই। ঘরে প্রায় সর্ব্বসমেত জন কুড়ি লোক কিন্তু একজনকেও চেনবার উপায় নেই। প্রত্যে-কেরই চোখের ওপর একটা করে কালো মুখোস। প্রত্যেকেই স্থির হয়ে বসেছিল। একজন মুখোস পরা আর্দ্দালি প্রত্যেকের সামনে এক পেয়ালা করে চা রেখে গেল। সিগারেট আর চুরুট টেবিলের ওপরেই যথেষ্ট ছিল।

কৌচের ওপর থেকে লোকটা ডাকল "দশ নম্বর ?" আর্দ্দালি সশব্যস্তে তার কাছে এসে দাঁড়াল। ভঙ্গীতে তার একটা নম্রতা।

"আমার তামাক!" লোকটার গলায় আদেশের দৃঢ়তা।

আর্দ্দালি প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বলল "হুজুর আব্বাসের দোকান বন্ধ ছিল। তার ওখানে ছাড়াত অম্বুরী আর কড়া মেশান তামাক কোথাও পাওয়া যায় না।"

কৌচের লোকটা হাঁক দিল "তিন নম্বর!"

চেয়ার থেকে একজন লোক উঠে এল। তার মুখোসের ওপর একটা তিন আঁকা।

তিন নম্বর জিগেস করল দশ নম্বর তুমি কতদিন দলে ঢুকেছ ?"

দশ নম্বর নীচু ঘরে জবাব দিল "তিন মাস হুজুর!"

"এখনও জাননা যে এক নম্বরের মুখের কথাই আইন ? দোকান বন্ধ ছিল ভেঙ্গে আননি কেন ?"

"আমি আমি..........."

"আমি আমি..." তিন নম্বর ভেঙ্গচি কাটল "যাও নিয়ে এস। আজকের ইসারা 'বিশ্বাস'।"

দশ নম্বর চলে গেল।

কৌচ থেকে এক নম্বর বলল "ধন্যবাদ তিন নম্বর।"

এই সময় দরজায় তিনটে টোকা পড়ল। এক নম্বরের কৌচের পাশে একটা লাল বাতী জ্বলে উঠল। ঘরে মুখর নিঃশব্দতা। বাইরে থেকে শোনা গেল "বিশ্বাস!" এক নম্বর কৌচের পাশে একটা বোতাম টিপলেন। দরজা খুলে গেল। আর একজন মুখোস পরা লোক ঢুকল ঘরে। তার মুখোসের ওপর দুই আঁকা।"

"কি খবর দু নম্বর?" এক নম্বর প্রশ্ন করলেন। দু নম্বর এগিয়ে এল "নাকটা কেমন আছে?"

"একটু যন্ত্রণা হচ্ছে কিন্তু পনেরো নম্বর ড্রেস করে দিয়েছে। পনেরো নম্বর আমাদের এক্সপার্ট সার্জ্জন। তুমি চিঠিটা দিয়ে এসেছ?"

"হ্যাঁ।"

"খবর নিয়ে কি জানলে?"

"অত্যন্ত সাধারণ লোক। বাপ নেই বিধবা মা আর এক অবিবাহিতা বোন আছে। ব্যাঙ্কের কেসিয়ার। নিতান্ত সাধারণ লোক। ভয় নেই।"

এক নম্বর হাসল "সাধারণ লোককেই সব চেয়ে বেশী ভয় দু নম্বর—পুলিশের [illegible] আমাদের জানা আছে। সাধারণ লোক কি করে বসে ঠিকানা নেই। এই আমরাও ত সব সাধারণ লোক বলেইত পুলিশ আজও আমাদের ঠিকানা পায়নি।"

সমস্ত দল থেকে একবাক্যে প্রতিধ্বনিত হোল "ঠিক!" দলের একজন বলল "কিন্তু ব্যাঙ্কের সেই কেসিয়ারটার ওপর আমাদের রাগ কিসের?"

দু নম্বর গর্জ্জে উঠল "রাগ নেই? আমাদের এক নম্বরকে যে আঘাত করে তাকে আমরা ছেড়ে দেব? এই সমস্ত দলটার মস্তিস্ক কে? এক নম্বর না থাকলে আজ আপনারা সকলে জেলের লোহার গরাদের অন্য পাশে বিশ্রাম করছেন।" দু নম্বর বিশ্রী হাসি হেসে উঠল। প্রশ্নকারী তখন কুঁকড়ে গেছে।

এক নম্বর, কৌচে উঠে বসল!

"ভদ্র মহোদয়গণ আজ আমরা আর একটা কাজে কৃতকার্য্য হয়েছি। যদিও আমাদের আশানুযায়ী অর্থ সংগ্রহ হয়নি—এবং সেটা সেই কেসিয়ারটার দোষে।"

দল একসঙ্গে গর্জ্জে উঠল "তার নাম? তার নাম? আমরা তাকে পৃথিবীর থেকে ভাল যায়গায় পাঠিয়ে দেব।"

এক নম্বর হাসল "আমাদের এ দলে কেউ কারও নাম জিগেস করে না। নাম এখানে পবিত্র। নাম জানা মানেই জেলের দরজাকে এগিয়ে আনা। নাম জানলেই আপনারা পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহ করবেন। তাছাড়া এক নম্বর অর্থাৎ আমি এবং দু নম্বর ছাড়া এ দলে সকলেই সমান এখানে উঁচু নীচু পদ নেই। যদি

আপনারা নাম জানতেন এবং ধরুন আপনাদের একজন কেউ উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী, তিনি হয়ত দেখতেন তাঁর অধীনস্থ ক্ষুদ্রতম কেরাণীও দলে তাঁর সমান হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই জন্য দলে একমাত্র আমি ছাড়া নাম কেউ জানে না।

আর সেই কেসিয়ারটার কথা ভাববেন না। তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

এক নম্বর একটু হেসে বলল "যাক আজ আপনাদের সে জন্য এখানে ডাকা হয়নি। আজ আমাদের আর একটা অভিযান কৃতকার্য্য হয়েছে। তার যথারীতি ভাগের জন্যই আপনাদের ডাকা। যদিও মাত্র সাতজন আমরা গিয়েছিলাম তবু অংশ সকলেই পাবে।"

এক নম্বর চুপ করল। দলের সকলের মধ্যে একটা মৃদু আনন্দ গুঞ্জন শোনা গেল। এক নম্বরের কৌচের পাশের আলোটা হঠাৎ জ্বলে উঠল আবার। দরজায় মৃদু টোকা, এবং শোনা গেল—'বিশ্বাস!"

দরজা খুলে গেল।

দশ নম্বর তামাক নিয়ে এসেছে এক নম্বরের জন্য।

দত্ত দাস অ্যাণ্ড কোম্পানীর দোকানে, লোহার সিন্দুকের তালা বন্ধ করতে মনোহর বাবু বলছিলেন

"দেখেছ, হরনাথ কলকাতা হয়ে উঠল কি? এ সব মোটা মোটা তালাচাবী লাগিয়েও স্বস্তি নেই। কখন কি যে হয়?"

মনোহর বাবুর অংশীদার হরনাথ দত্ত প্রায় তাঁর সমবয়সী তবে চেহারায় একটা উগ্রতা আছে। মনোহর বাবুর মত নম্র শান্ত নয়। তাছাড়া হরনাথের বাবুগিরির খুব সখ এখনও। চুলের ধারগুলোয় সাদার ছোপ তাঁর যত লাগছে আদ্দির পাঞ্জাবী, উড়ুনী ততই পাৎলা হচ্ছে। আর তাঁর প্রধান গর্ব্ব বুকের ওপর পাৎলা সরু বিশেষ কারুকার্য্য করা সোনার ঘড়ির চেনটা।

মনোহর বাবুর কথায় হরনাথ হাসলেন "তুমি ভারী ভীতু মনোহর! এত লোকালয়ের মধ্যে এখানে কি ডাকাতে কিছু করতে পারে?"

মনোহর বাবু শান্তস্বরে বললেন "হীরালাল ক্ষেত্রীর ওখানেও ত লোকালয় কম নয়! আর আজকের ব্যাঙ্ক লুঠে আমিত স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আমার ভয় করছে হরনাথ। সাধারণ লোকের অনেক সোনাদানা আমাদের কাছে গচ্ছিত রয়েছে। একবার গেলে একেবারে পথে বসব আমরা।

"আমি থাকতে তুমি পথে বসবে না মনোহর। আমি দুটি খেতে পেলে তুমিও পাবে। আর তুমি ডুবলে আমিও ডুব্‌ব।"

নিশাচর।

হরনাথের স্বরে একটা অদ্ভুত সততা ছিল। মনোহর বাবুর মুখ ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তিনি বললেন "তবু ভয় করে। আমার বড় ভয় করে!"

"ভারী নার্ভাস! নাও নাও নতুন বড় তালাগুলো লাগিয়েছ?"

লোহার কোল্যাপ্‌সিব্ল গেটটায় গোটা পাঁচেক ভারী ভারী তালা লাগিয়ে তাঁরা পথে নেমে এলেন। রাত্রি প্রায় দশটা। একটা পুলিশ খৈনি ডলতে ডলতে লাঠি হাতে আসছিল।

হরনাথ বললেন "এইত এখানে পুলিশ রোঁদে দেবে সারা রাত।"

"হুঁ! মনোহর বাবু জবাব দিলেন "পুলিশের ওপর বিশ্বাস কমে আসছে হরু!

বন্ধু না শত্রু ?

পরদিন সকালে সুরজিত ব্যাঙ্কে এসে যথা পরিচিত ডেস্কটায় বসতে যাচ্ছে, এমন সময় কামরা থেকে ম্যানেজার বেরিয়ে এলেন। সাদা ট্রাউজার, গায়ে সাদা হাফশার্ট—"বোস শুনে যাও!"

সুরজিত ম্যানেজারের কামরায় ঢুকল।

ম্যানেজার বলল "আমরা একজন নতুন ক্যাসিয়ার ঠিক করেছি। আজ থেকে তুমি ওখানে বসবে না।"

সুরজিত হতভম্ব হয়ে গেল।

"তুমি সংখ্যায় বড় কাঁচা কিন্তু তুমি একজন সাহসী লোক। ব্যাঙ্ক একজন প্রাইভেট গার্ড নিযুক্ত করতে চায়। তোমার সাহস আছে বুদ্ধি আছে, শক্তিও কম বলে মনে হয় না। তোমাকে একটা চান্স দিয়ে দেখতে পারি। তুমি যা মাইনে পেতে তার ডবল পাবে।"

একটু থেমে ম্যানেজার জিগেস করলে "আপত্তি আছে বোস?"

নিশাচর !

"কিছু না ! কিন্তু এরই মধ্যে আমি ওই দলের চিহ্নিত লোক হয়ে গেছি।"

"কি রকম ?"

সুরজিত পকেট থেকে চিঠিটা বার করে দিল।

ম্যানেজার বলল "হুঁ টাইপ করা দেখছি। ভাষাটা কি ?"

"বাংলা।"

"বাংলায় টাইপ করা চিঠি দেয়—দলটার সবই খুব বিজ্ঞান সম্মত দেখছি।"

সুরজিত হাসল "কিন্তু মিষ্টার গাফ্ প্রত্যেক অপরাধীর প্রধান ভুল কি জানেন ? অতিরিক্ত আত্ম-বিশ্বাস !"

"কি লিখেছে ?"

"আমাকে সাবধান করে দিয়েছে ওদের নিয়ে যেন মাথা না ঘামাই।"

"তোমাকে ?"

"হ্যাঁ ! সেটা একটু আশ্চর্য্য নয় ?"

"হুঁ !" ম্যানেজার সুর টেনে বললেন "তবে তুমিইত তাদের দলপতিকে আক্রমণ করেছিলে। সে জন্য হতে পারে।"

সুরজিত বলল "প্রথম দৃষ্টিতে তাই মনে হতে পারে কিন্তু আমি একজন পেটি কেসিয়ার, উত্তেজনার মুখে

একটা কিছু করে ফেললেও আমাকে ওয়ার্নিং দেবার কোন মানে হয় না। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন? কালই আমাদের আফিসে সব চেয়ে কম লোক ছিল আর কালই তারা আক্রমণ করেছে। খবর পেল কি করে?"

ম্যানেজার লাফিয়ে উঠলেন "অ্যাঁ? তার মানে..."

"হ্যাঁ মিষ্টার গাফ্ আমার ধারণা আফিসের কারও কাছে ওরা খবর পেয়েছিল। এবং সেই জন্য আমার উপর লক্ষ্য।"

ম্যানেজার হাঁ হয়ে গেলেন "আমার, আমার আফিসের লোক?"

সুরজিত বলল "তবে যা বলছিলাম মিষ্টার গাফ্ —অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস! প্রথমতঃ আমাকে সাবধান না করলে এ সব হয়ত মাথায় আসত না। দ্বিতীয়তঃ এই চিঠি।"

"চিঠিতে কি?" ম্যানেজার প্রশ্ন করল।

"চিঠিটা টাইপ্‌রাইটারে ছাপা। টাইপ্‌রাইটার ট্রেস্ করা অসম্ভব নয়—বিশেষতঃ বাংলা টাইপ্‌রাইটার।"

ম্যানেজার সুরজিতের পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন "আ! তুমি একজন চালাক লোক। তাহলে চিঠিটা প্রথমে পুলিশে দিয়ে এস।"

নিশাচর।

"হ্যাঁ! একটা কথা মিষ্টার গাফ,—আমি স্পে-গার্ড নিযুক্ত হয়েছি এটা এখন সকলের কাছে গোপন রাখবেন।"

সন্ধ্যাবেলা রিজার্ভব্যাঙ্কে চারজন বন্দুক হাতে পাহারাদার সমেত ক্যাস জমা দিয়ে সুরজিত গাড়ী ছেড়ে দিল। সন্ধ্যার পর সে ব্যাঙ্কে ফিরবে। ব্যাঙ্কের প্রধান দরজা বন্ধ হয়ে গেলে তার বাইরে যে ঘরখানা সেটাতে তার রাতের আস্তানা হয়েছে। সুরজিত ভাবল তার কাজটুকু সে হেঁটেই সেরে নেবে। একটু ব্যয়াম দরকার। প্রথমে সে বেঙ্গল টেলিফোন কর্পোরেশনের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করল। কিছুক্ষণ কথা হোল সাহেবের সঙ্গে।

সাহেব জিগেস করল "আপনার ম্যানেজারের পারমিসন্ কোথায়?"

সুরজিত একটা চিঠি বার করে দেখাল।

"হুঁ! ঠিক আছে। আপনি তা হলে আমাদের কি করতে বলেন?"

"আপনাকে শুধু জানিয়ে গেলাম। বাকীটা আমি নিজেই করে নিতে পারব।"

"হুঁ! আপনি এমন ভাবে টেলিফোন ট্যাপ্ করতে চান যেন কেউ জানতে না পারে এইত?"

"হ্যাঁ !"

"আচ্ছা আমি আপনাকে খানিকটা স্পেশাল ভার দিচ্ছি যা সহজে কারও নজরে আসবে না।"

সুরজিত বলল "ধন্যবাদ।"

"আর গার্ড রুমের সঙ্গে লালবাজারের বেলপুস কানেক্ট করা আছে পায়ের সঙ্গে।"

সুরজিত সাহেবকে আবার ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল।

পথে যখন সে নেমে এল হঠাৎ ঝম ঝম করে এক পশলা বৃষ্টি সুরু হোল। সুরজিত এক ছুটে এসে একটা বারান্দার নীচে আশ্রয় নিল। হঠাৎ বৃষ্টি আসায় দেখতে দেখতে শুকনো বারান্দার তলাটা ভরে উঠল। বৃষ্টি থেকে সবাই মাথা বাঁচাতে ব্যস্ত। জায়গাটা দেখতে দেখতে বাংলা ছবির সাড়ে চার আনার টিকিট ঘরেরও অধম হয়ে উঠল।

"আঃ একটু সরুন না মশাই !"

"কোথায় সরব ?"

"না সরেন ত ঠেলে জায়গা করে নিতে হবে।"

প্রথম এবং দ্বিতীয় বক্তার মধ্যে মুহূর্ত্তের মধ্যে হাতাহাতি হয়ে ওঠবার জোগাড়। তাদের থামাতে গিয়ে হট্টগোল উঠল পাকিয়ে।

সুরজিত একপাশে দাঁড়িয়ে ভাবছিল—এই আমাদের

নাগরিক জ্ঞান ! কেউ কারও ছোঁয়া সহ্য করবেনা, কারও এতটুকু ত্যাগ নেই। একপাল ছাগলের মত সবাই গুঁতোগুঁতি করতে চায়।

হঠাৎ কাণের কাছে সুরজিত শুনল "পালান! যান এখান থেকে শিগগির!"

সুরজিত চমকে মাথা ফেরাল। কে, কে বলল ?

বচসা তখন সপ্তমে উঠেছে।

হঠাৎ সুরজিত একটা শব্দ শুনল প্লপ্ !

তার কাণের পাশ দিয়ে হুইস্ করে কি যেন একটা বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুরজিত ভিড়ের মধ্যে মারল ডুব। এবং পরমুহূর্ত্তে একলাফে সামনের চলন্ত ট্যাক্সি-খানায় ঝাঁপিয়ে উঠল।

ট্যাক্সিওয়ালা ব্রেক কসছিল, সুরজিত চেঁচিয়ে উঠল "রোখো মৎ! পাঁচ রূপেয়া বকসিস্।"

ট্যাক্সির মধ্যে থেকে একটা হাত কম্পিত হস্তে কিন্তু দৃঢ়মুষ্টিতে তার হাত চেপে ধরল।

একটা হুকুম শোনা গেল "চালাও।"

ট্যাক্সি বৃষ্টির পরদা ভেদ করে ঝড়ের মত ছুটে চলল।

এইবার ট্যাক্সির যাত্রীকে লক্ষ্য করিবার সময় পেল সুরজিত এবং লক্ষ্য করে বলে উঠল "আরে মিষ্টার দালাল ?"

তাদের ব্যঙ্কের অ্যাকাউণ্টেণ্ট।

"হ্যাঁ ব্যাপার কি বোস ?"

"কে একজন ভিড়ের মধ্যে আমাকে গুলি করেছিল ?

"কি সর্ব্বনাশ !" মিষ্টার দালাল লাফিয়ে উঠলেন

সুরজিত গাড়ীর মধ্যে দিয়ে পেছনে তাকাল।

"আর একটা গাড়ী আমাদের অনুসরণ করছে

"অ্যাঁ ?"

"হ্যাঁ ! শুয়ে পড়ুন মিষ্টার দালাল।"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সির ডান দিকে এ প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। ট্যক্সিটা ঘুরে ফুটপাতে লেগে কাৎ হয়ে গেল। এক মুহূর্ত্ত সুরজিত চোখ বুজে ছিল। চোখ খুলে দেখল সামনে একটা গাড়ী ঝড়ের মত বেরিয়ে যাচ্ছে আর পাশে তাদের অ্যাকাউণ্টেণ্ট মিষ্টার দালাল অদৃশ্য হয়ে গেছেন। ট্যাক্সিওয়ালা ভীষণ চীৎকার করে গালাগাল দিচ্ছে।

সুরজিত লাফিয়ে উঠে ট্যাক্সিওয়ালাকে জিগেস করল "গাড়ীর নম্বরটা নিয়েছ ?"

"হাঁ সাব।"

"কত ?"

ট্যাক্সিওয়ালা বলল।

সুরজিত মনে মনে গালাগাল দিয়ে উঠল। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের গাড়ীর নম্বর।

"আমার সঙ্গে যে সাহেব ছিল কোথায় গেল?" সুরজিত প্রশ্ন করল।

"মালুম নেই সাব!

"মালুম নেই! সুরজিত গর্জ্জে উঠল "গাড়ী চালাচ্ছ সওয়ারী ভাগ গিয়া!"

কিন্তু তার ভয় অকারণ একটু দূরেই তাদের অ্যাকাউণ্টেণ্টের লম্বা চেহারা দেখা গেল ছুটতে ছুটতে আসছে। তখন ট্যাক্সিটার আশপাশে প্রচণ্ড বৃষ্টি সত্ত্বেও লোক জমতে সুরু হয়েছে।

অ্যাকাউণ্টেণ্ট হাঁফাতে হাঁফাতে এসে জিগেস করল "বোস তুমি ঠিক আছ? চোট লাগেনি ত?"

"না। আপনি?"

"ঠিক আছি।"

"কোথায় গিয়ে ছিলেন?"

"লালবাজারে টেলিফোন করে এলাম।"

সুরজিত বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার মিষ্টার দালালের মুখের দিকে তাকাল।

অন্ধকার ঘরটার, ইজি চেয়ারটায় সুরজিত গা এলিয়ে দিয়েছিল। ওপাশে দরোয়ানের ঘরটা থেকে রাম ভজনের সুর ভেসে আসছে। ব্যাঙ্কের আগাগোড়া

দরজা জানালায় 'বার্গলার অ্যালাম' লাগিয়ে সুরজিত খানিকটা নিশ্চিন্ত। সে চোখ বুজে দিনের ঘটনাটা ভাবছিল।

সেই ভিড়ের মধ্যে কে তাকে পালাতে বলল? আর তার ওপরই বা দলটার রাগ কিসের? তাকে ওয়ার্ণিং দেবার, তাকে আক্রমণ করবার মানে কি? আর হত্যা করবারই যদি উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তখন তাকে সাবধান করে দিল কে? অথচ তাদের ট্যাক্সিটা ধাক্কা লাগিয়ে আততায়ী পালিয়ে গেল। তখন স্বচ্ছন্দে গুলি করতে পারত। কিন্তু তা করল না। কেন? ভাগ্যে সেই সময় তাদের অ্যাকাউন্টেন্টের গাড়ীটা যাচ্ছিল।

আর হঠাৎ সুরজিত উঠে বসল। ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের অ্যাকাউন্টেন্টের সঙ্গে যোগা যোগ এটা কি অ্যাকসিডেন্ট?

হাতের পাশে টেলিফোনটা ঘড় ঘড় করে উঠল। সুরজিত আলগাভাবে রিসিভারটা তুলে নিল।

"হ্যালো! হ্যাঁ আমি সুরজিত!"

আর সে শুনল "you fool! তোমাকে নিশাচরের দলে মাথা গলাতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে না? মিছি মিছি কেন মরণের সঙ্গে খেলা করছ?"

সুরজিত বলল "কে আপনি?"

ওপার থেকে রিসিভারের মধ্যে একটা হাসির শব্দ

ভেসে এল "নাম জিনিসটা পবিত্র! আমাদের মধ্যে নাম কেউ বলে না। তুমি এর থেকে সরে যাও।"

"ধন্যবাদ!" সুরজিত পায়ের কাছে বেল পুস্‌টায় চাপ দিল এবং সেই রিসিভারটার মধ্যে কথা বলতে বলতে পাশের আর একটা রিসিভার তুলে নিল। এক মুহূর্ত্ত প্রথম রিসিভারটার মুখ চেপে ধরে দ্বিতীয়টাতে তাড়াতাড়ি কথা বলল "ইন্সপেক্টর সুশীল বাবু? একজন অজানা লোক আমার সঙ্গে কথা বলছে—নিশাচর! কল্‌টা ট্রেস করুন।"

দ্বিতীয়টা রেখে দিয়ে প্রথমটায় আবার বলল "হ্যাঁ মরণের সঙ্গে খেলা করতে ভারী মজা লাগে আমার। সেটা দুদিকেই কি না! কে মরবেত বলা যায় না আমি না নিশাচর......"

"...না না!" একটা দলের বিরুদ্ধে তুমি একা কি করতে পার? Young man, fools rush in where angels fear to tread! তোমার ভালর জন্যেই বলছি। তুমি এর মধ্যে মাথা গলিও না। সেজন্য লোক আছে।"

সুরজিতের কেমন সন্দেহ হোল "তুমি কে?"

"বলেছি ত নাম জিগেস করতে নেই।"

"আচ্ছা তুমি কি সন্ধ্যেবেলা আমায় সাবধান করে দিয়েছিলে?"

একটা ছোট্ট তেতো হাসি ভেসে এল টেলিফোন রেখে দেওয়ার শব্দ—ক্লিক্ ক্লিক্!

লাল বাজারের সঙ্গে কানেক্ট করে সুরজিত ডাকল "সুশীল বাবু?"

"হ্যাঁ!"

"কলটা ট্রেস করেছেন?" গলায় উত্তেজনা

"হ্যাঁ!"

"কোথা থেকে? কোথা থেকে?"

"ওদের কি এত বোকা পেয়েছেন সুরজিত বাবু? পাব্লিক টেলিফোন বক্স থেকে। বরং লক্ষ্য করেছেন আপনার নতুন পদ ওরা জানে।"

সুরজিত শপথ করে উঠল।

পরদিন সকালে কলকাতা আবার একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে জেগে উঠল।

আগের দিন দোকানে একটু বেশী রাত অবধি কাজ হয়েছিল বলে সে দিন সকালে মনোহর বাবুর ঘুম ভাঙ্গতে একটু দেরী হয়ে ছিল। তাছাড়াও আগের রাতে একটু বেশী রাত অবধি তিনি পড়েছিলেন। প্রত্যেক মানুষেরই একটা না একটা হবি থাকে। মনোহর বাবুর বাতিক ছিল পড়া। তাঁর বিছানাটার পাশে একটা

সুদৃশ্য টেবিল ল্যাম্প আর বিছানায় বই ছড়ান। নাটক নভেল পড়তে মনোহর বাবুর ভাল লাগত না। তিনি পড়তেন রাজনীতি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি।

সে দিন সকালে তাঁর চাকর যদু তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়ে চা আর খবরের কাগজ রেখে গেল। চায়ে দু' চুমুক দিয়ে কাগজের দুটো পাতা উল্টেই মনোহর বাবু লাফিয়ে উঠলেন।

"আবার কলিকাতায় রহস্যময় লুণ্ঠন!"

"প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী সাতকাড়ি কুণ্ডুর সর্ব্বস্ব অপহৃত।"

মানোহর বাবুর চা শেষ হোল না। তিনি কোন মতে জামাটা গায়ে দিয়েই ছুটলেন।

কিছুদিন আগে তাঁর একপাশে হীরালাল ক্ষেত্রীর দোকানে লুঠ হয় আর কাল অপর পাশে সাতকড়ি কুণ্ডুর দোকানে। এবার বোধ হয় তাঁর পালা। নার্ভাস মনোহর বাবু হন্তদন্ত হয়ে অংশীদার হরনাথের ওখানে ছুটলেন।

মিটিং এর একটু খানি।

এক নম্বর বলছিলেন "...ভদ্র মহোদয়গণ আবার আমাদের অভিযান সফল হয়েছে। পুলিশ সম্পূর্ণ বোকা বনে গেছে। কিন্তু আমরা পুলিশকে বুঝিয়ে দেব যে

তারা এ দলের কাছে বুদ্ধিতে নেংটি ইঁদুরের সামিল। পর পর, পর পর পুলিশের বুকের ওপর আমাদের দল কাজ করে যাবে। পুলিশ নিঃশ্বাস ফেলতে সময় পাবে না। আজই আমার কাছে অদ্ভুত রকমের সহজ একটা লুঠের খবর এসেছে।”

গলা নামিয়ে এক নম্বর বললেন “একলাখ!”

দলে একটা চাপা গুঞ্জন।

এক নম্বর হাসলেন “এর চেয়ে বড় সংখ্যায় আমরা শিগ্‌গিরই হাত দিতে পারব। যাক আপনারা তৈরী থাকুন। যারা যারা যাবে তারা নোটিশ পাবে।

ভদ্র মহোদয়গণ মিটিং শেষ।

পরদিন ম্যানেজার ব্যাঙ্কে এসে সুরজিতকে তাঁর কামরায় ডাকলেন "বোস জান বোধ হয় আজ আমাদের গোল্ড বুলিয়ন ডেলিভারী দিতে হবে ?"

"জানি। কত সোনা ?

"প্রায় লক্ষ টাকার !"

"লক্ষ টাকার ?" সুরজিতের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল "অ্যামেরিকা যাবে নয় ?"

"হ্যাঁ আমরা এখানে জাহাজে তুলে দিতে পারলেই খালাস। কিন্তু আমার ভয় হয় বোস !"

হুঁ অ্যাকাউণ্টেণ্টকে ডাকুন !"

"কেন।"

সুরজিত হেসে বলল "তিনটে মাথা ত্নটোর থেকে ভাল।"

মিষ্টার দালাল ঘরে এলে ম্যানেজার বললেন "সোনা পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে মিষ্টার দালাল"

"হ্যাঁ সব রেডি।"

সুরজিত বলল "পাঠাবার কি ব্যবস্থা করেছেন ?"

"কেন যেমন যায়! চারজন বন্দুকধারী সিপাই থাকবে।"

"সেদিনের কথা কি ভুলে গেছেন মিষ্টার দালাল ? অসাধারণ সময়ে অসাধারণ রকম সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়!"

"হুঁ! কি করা উচিত ?"

ম্যানেজারও সুরজিতের মুখের দিকে তাকালেন। সুরজিত বলল "আমি বলি এক কাজ করা হোক। চারজন গুর্খা পাহারায় যেমন গাড়ী যায় তেমনি যাবে। কিন্তু সে গাড়ীটায় থাকবে শুধু তামার রাশ। সেই গাড়ীটা বেরিয়ে যাওয়ার দশ মিনিট পরে ম্যানেজারের প্রাইভেট গাড়ীতে আসল সোনা নিয়ে যাওয়া হবে। কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। হতভাগা ডাকাতগুলো যদিও খবর রেখে থাকে তারা ভুল গাড়ী আক্রমণ করে মরবে। আমরা কোন চান্স নিতে চাইনা কি বলেন ?"

ম্যানেজার বলে উঠলেন "By Jove! ঠিক বলেছে!

অ্যাকাউণ্টেণ্ট হেসে বলল "মিষ্টার বোসের বুদ্ধি আছে।"

"তা হলে" ম্যানেজার বললেন "মিঃ দালাল আপনি ব্যবস্থা করে ফেলুন।"

অ্যাকাউন্টেন্ট চলে গেলে চাপা গলায় সুরজিত বলল "সোনা ব্যাঙ্কের গাড়ীতেই যাবে মিঃ গাফ্। আমি সুশীল বাবুকে বলে সে গাড়ীর পেছনে স্পেশাল গার্ডের ব্যবস্থা করছি।"

মিষ্টার গাফ্ চমকে বললেন "তার মানে? তা হলে তোমার এ প্ল্যানের মানে?"

"একটা এক্সপেরিমেণ্ট মিষ্টার গাফ্! একটা থিওরী। আপনি কারুকে কিছু বলবেন না আমি ব্যবস্থা করছি।"

যথারীতি গুর্খা গার্ড সমেত মোটা কাঠের একটা প্যাকিং বাক্স সমেত ব্যাঙ্কের গাড়ী বেরিয়ে যাবার পর প্রায় মিনিট দশেক পরে আর একটা প্যাকিং বাক্স নিয়ে ম্যানেজারের গাড়ী বেরিয়ে গেল।

ব্যাঙ্ক প্রতিদিনের মতই গুঞ্জরিত। আফিসের কাজ পুরোদমে চলেছে। গাড়ীটা বেরিয়ে যাওয়ার পাঁচ মিনিট পরে সুরজিত ম্যানেজারকে সঙ্গে করে গার্ডরুমে এসে বসল।

সময় কেটে চলেছে। দেওয়ালে একটা ঘড়ি টক্ টক্ করে সেকেণ্ড জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ম্যানেজার পকেট থেকে একটা সিগারেটের কেস বার করে বললেন "স্মোক বোস?"

স্নুরজিত বলল "খাই না।"

সিগারেট একটা ধরিয়ে ম্যানেজার জিগেস করলেন "তোমার কি আইডিয়া বোস ?"

"বোধ হয় এখুনি জানতে পারব একটু অপেক্ষা করুন।"

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে স্নুরজিতের পায়ের কাছে বেলটায় আলো জ্বলে উঠতে সে দু নম্বর টেলিফোনটা তুলে নিয়ে চাপা গলায় বলল "হ্যালো স্নুশীল বাবু ?"

জবাব এল "হ্যাঁ !"

"কি খবর ?"

"নিরাপদ !"

স্নুরজিত ফোনটা নামিয়ে রেখে ম্যানেজারকে বলল "সোনা নিরাপদে জাহাজে পৌঁছে গেছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ম্যানেজার উঠে দাঁড়াচ্ছিল; স্নুরজিত বলল "আর একটু বস্নুন মিষ্টার গাফ্। আমি দ্বিতীয় গাড়ীটার খবর এক্সপেক্ট করছি।

"দ্বিতীয় গাড়ীটা ?"

"হ্যাঁ।"

প্রায় এক ঘণ্টা পরে স্নুরজিতের এক নম্বর টেলিফোনটার পাশে একটা ছোট্ট সাদা আলো জ্বলে উঠতেই কম্পিত হাতে সে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে কাণে দিল। আর ম্যানেজারকে দ্বিতীয়টায় শুনতে নির্দ্দেশ করল।

"হ্যালো ছ নম্বর ?" অত্যন্ত চাপা অস্বাভাবিক গলা। "তোমার কথামত আমরা দ্বিতীয় গাড়ীটায় উঠেছিলাম ......হ্যাঁ হ্যাঁ মাল সব পেয়েছি তবে প্যাকিং বাক্স ভর্ত্তি জমা !

ম্যানেজারের হাতের রিসিভারটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, সামলে নিয়ে তিনি বললেন "এর মানে কি ? কে বলছে ?" সুরজিত জবাব দিল "অ্যাকাউন্টেন্টের সঙ্গে কথা হচ্ছে। ওর টেলিফোন আমি ট্যাপ করে রেখেছি।"

ম্যানেজার অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠলেন "আমার অ্যাকাউন্টেন্ট ?"

"হ্যাঁ মিষ্টার গাফ্ আসুন শিগ্গির !"

গার্ডরুম থেকে বেরিয়ে সুরজিত ব্যাঙ্কের বড় দরজাটার পাশে এসে দাঁড়াল।

"বাইরে কোথায় ?" ম্যানেজার জিগেস করলেন।

"কিছু বলবেন না একটা সিগারেট ধরান !" খোলা দরজার পেছনে সুরজিত ঢুকে গেল !

খোলা দরজার সামনে ম্যানেজার দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছেন। একটা শিথিল গতিতে অ্যাকাউন্টেন্ট বেরিয়ে এল বাইরে। ম্যানেজার বললেন "হ্যালো মিষ্টার দালাল কোথায় যাচ্ছেন ?"

"আপনিও নড়বেন না"

অ্যাকাউন্টেণ্ট হাসল "লাঞ্চের সময় হোল মিষ্টার গাফ্, আপনি যাবেন না ?"

"হ্যাঁ কিন্তু তার আগে একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে। একবার ভেতরে আসুন!"

অ্যাকাউন্টেণ্ট একটু মৃদু হেসে পকেটে হাত দিল "মিষ্টার গাফ্ আমার পকেটে একটা দোনলা রিভল্ভার রয়েছে, তাতে সাইলেন্সার লাগান···নড়বেন না খবরদার ······মুখ দিয়ে একটা কথা বার হলেই আপনি মারা পড়েছেন! আস্তে আস্তে পেছোন···জল্দি···!"

ঠিক সেই সময় অ্যাকাউন্টেণ্টের পেছনে পাঁজরে একটা শক্ত জিনিস এসে লাগল। সুরজিতের ফিস ফিস করে কড়া গলা শোনা গেল "আপনিও নড়বেন না মিষ্টার দালাল! আমার রিভলভারটায় সাইলেন্সার লাগান নেই কিন্তু আমাদের আওয়াজের ভয় নেই। চট্ করে হাত তুলে ফেলুন মাথার ওপর······শিগ্গির...!

অ্যাকাউন্টেণ্টের হাত দুটো মাথার ওপর উঠে গেলে সুরজিত ম্যানেজারকে বল্ল "পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে নিন মিষ্টার গাফ্! বেশ! এইবার মিষ্টার দালাল ম্যানেজারের কামরা···পা চালান জলদি!"

ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপাশে সুরজিত অ্যাকাউন্টেণ্টকে বসতে বলল। আর টেবিলের এপারে দরজার দিকে পেছন করে, যাওয়ার পথ বন্ধ করে, দুটো

চেয়ার টেনে নিয়ে সে আর মিষ্টার গাফ্ বসল। সুরজিতের হাতে খোলা পিস্তল।

ম্যানেজার বললেন "এইবার মিষ্টার দালাল, আপনার কি বলবার আছে?"

অ্যাকাউন্টেন্টের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে, ঠোঁটের দুটো পাশ কাঁপছে।

সুরজিত বলল "আপনার এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে অ্যাপ্রুভার হওয়া! আপনি যদি সব কথা খুলে বলেন অন্ততঃ আমরা আপনাকে ফাঁসী কাঠ থেকে বাঁচাতে পারি।"

অ্যাকাউন্টেন্ট নিথর!

"তাড়াতাড়ি ঠিক করুন" টেলিফোনটার ওপর হাত রেখে সুরজিত বলল।

ভাঙ্গা গলায় কাঁপতে কাঁপতে অ্যাকাউন্টেন্ট বলে উঠল "বলব আমি সব বলব দোহাই আপনার টেলিফোনটা রেখে দিন।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকাউন্টেন্টের মুখের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে সুরজিত বিস্মিত হয়ে গেল। মুখটা তার হাঁ হয়ে গেছে ঠোঁটের দুপাশ বেয়ে নাল গড়িয়ে পড়ছে, চোখের দৃষ্টি দরজার ওপর স্থির। সেখানে একটা অদ্ভুত ভয়ের ছাপ।

সুরজিত আর দেখল না—সঙ্গে সঙ্গে সে সেক্রে-

টারিয়েট টেবিলটার তলায় ডুব মারল। আর তেমনি সঙ্গে সঙ্গে দুটো আওয়াজ হোল—প্লপ্ প্লপ্!

সুরজিত টেবিলের নীচে থেকেই দেখল অ্যাকাউণ্টেণ্ট ঘুরে পড়ে গেল; আর দরজায় কালো মুখোস পরা একটা লোক।

সুরজিতের পিস্তলও গর্জ্জে উঠল তার পরে কি হোল দেখবার আগেই ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে গেল। সুরজিতের চোখ মুখ জ্বলে উঠল। জ্ঞান হারাবার আগে সে বুঝল ঘরে টিয়ার গ্যাস বোমা মারা হয়েছে।

সুরজিতের জ্ঞান হোল হাঁসপাতালে। ম্যানেজার মিষ্টার গাফও তখন সবে উঠে বসেছেন।

ইন্সপেক্টর সুশীলবাবু বললেন "কেমন লাগছে এখন আপনাদের?

সে কথার জবাব না দিয়ে সুরজিত বলল "অ্যাকাউন্টেণ্ট?"

"মারা গেছেন!"

"ওঃ সুশীলবাবু কি চান্সই একটা নষ্ট হয়ে গেল! নিশাচর দলকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও ফস্কে

"কি রকম?"

সুরজিত খুলে বলল সব।

"হুঁ !" সুশীলবাবু বললেন তামার গাড়ী লুঠ করেই দল বুঝতে পেরেছিল যে আপনারা অ্যাকাউণ্টেণ্টকে সন্দেহ করে চালাকী করেছেন। তারা আর এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করেনি।"

বন্দী

এই সব ঘটনার পর কয়েকটা দিন কেটে গেছে। পর পর এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারে কলকাতাবাসী যেন এক যোগে চীৎকার করে উঠেছিল তাই কি দল চুপ চাপ? না দলে অন্য কিছু ঘটেছে?

এক নম্বর বলছিলেন......ভদ্র মহোদয়গণ কিছুদিন হোল আমাদের সময় খারাপ পড়েছে। সেই ব্যাঙ্কের গোল্ড বুলিয়নের কাজটায় অকৃতকার্য্য হওয়া অবধি যেন আর কোন সফল কাজে আমরা হাত দিতে পারছি না।

স্যার রমেনের বিখ্যাত পঞ্চাশ হাজার টাকা দামের মুক্তোর মালা আমরা লুঠ করলাম...খবরটা ছিল দশ নম্বরের।"

দশ নম্বর দাঁড়িয়ে উঠে বলল "স্যার রমেনের মত বিখ্যাত লোকের স্ত্রী যে ঝুটো মুক্তোর মালা পরে লোককে ঠকান কি করে জানব?"

"হুঁ দশ নম্বরের এসিয়া ইনভেষ্টমেণ্টের খবরটা খুবই ভাল ছিল কিন্তু সেখানে দেখা গেল ডিটেক্‌টিভ

ঘেরাও। ডিটেক্‌টিভ কি আমার চোখে ফাঁকী দিতে পারে? যাক কৃতকার্য্যতার সঙ্গে অকৃতকার্য্যতাকেও মেনে নিতে হবে। কিন্তু যদি কোন মানুষের জন্য দল অকৃতকার্য্য হয়ে থাকে তাকে দলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। এমনি একটা ব্যাপারের জন্যেই আপনাদের আজ ডাকা……

সুরজিত মাইনে পেয়েছে।

তার বোন অণিমা এসে সেদিন বলল "দাদা আমার এই চুড়ীটা ভেঙ্গে একটা নতুন প্যাটার্ণের চুড়ী করিয়ে দিতে হবে।"

"নতুন আবার প্যাটার্ণ কি হোল? মেয়েগুলোর মাথায় যত সব ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি!"

"নাঃ" অণিমা হেসে বলল "খালি দিনরাত ছুরি ছোরা গুলি গোলা এই সব হবে নয়? নাও বলবে মেট্রো চুড়ী।"

"ওরে বাবা! সে আবার কোথায় পাওয়া যায়?"

"বড় বাজারে দত্ত দাস এণ্ড কোম্পানী!"

"হুঁ!"

সুরজিত চলে যাচ্ছিল

"এ চুড়ীগুলো নিলেনা দাদা ?"

"থাক ওগুলো ভেঙ্গে কি হবে ? নতুন গড়ালেই হবে।"

সুরজিত ব্যাঙ্কে যাবার আগে দত্ত দাস এণ্ড কোম্পানীর দোকানে এল। মনোহর বাবু দরজার কাছেই একটা ডেস্কের ধারে বসেছিলেন। একটু দূরে লোহার গরাদে দেওয়া কাউণ্টার। ওপারে কাজ চলছে, টাকা বাজছে ঝন ঝন। লেন দেন সুরু হয়েছে। কাউণ্টারের মোটা মোটা ষ্টীলের গরাদ আর তার পেছনে লোহার ষ্ট্রং রুমটা দেখে সুরজিত বিস্মিত হোল। তাদের ব্যাঙ্কের ভল্টের চেয়েও সুরক্ষিত।

মনোহর বাবু সুরজিতকে দেখেই মিষ্টি গলায় বলে উঠলেন "আসুন আসুন !"

যেন কত পরিচিত।

এই অমায়িক ব্যবহারের জন্যই দত্ত দাস এণ্ড কোং আজ সকলের এত প্রিয়।

সুরজিত চুড়ীর অর্ডার দিল তারপরে কাউণ্টারের দিকে চেয়ে হেসে বলল "বাবা ! ওদিকটা যে একেবারে জেলখানা বানিয়ে ফেলেছেন !"

মনোহর বাবুর হাসি মুখ গম্ভীর হয়ে গেল "জানেন না বুঝি ? ওপাশে হীরালাল ক্ষেত্রী আর এ পাশে সাতকড়ি কুণ্ডুর দোকান লুঠ হয়ে গেছে। মধ্যে আমরা ! কখন

কি যে হয়, ভয়ে ঘুম হয় না মশাই। অর্ডারটা কি নামে থাকবে ?”

“সুরজিত বসু।”

মনোহর বাবু হেসে বললেন “সুরজিতের এখন দরকার নেই—কলকাতায় এখন কয়েকজন অসুর-জিতের দরকার কিছু মনে করবেন না সুরজিত বাবু! হাঃ হাঃ!”

“নানা মনে করব কেন ? সত্যিই অসুরের উপদ্রব বড় বেড়েছে! পুলিশও কিছু করতে পারছে না।”

“পুলিশে কি আর সে রকম লোক আছে সুরজিত বাবু ? হ্যাঁ ছিলেন একজন—ইন্সপেক্টর রবীন মুখুজ্জে নাম শুনেছেন নিশ্চয় !”

সুরজিত ঘাড় নাড়ল।

“তিনি থাকলে কি আর আজ আমাদের ভাবনা ছিল ? ডাকাতগুলোও উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পেত! বেচারা অকালে মারা গেলেন।”

সুরজিত বলল “কিছু অ্যাডভান্স দিতে হবে ?”

“ছি ছি! সে কি কথা!” মনোহর বাবু জিভ কাটলেন “আপনাদের মত খদ্দেরের কাছে বায়না চাইব ?

সুরজিত পথে নেমে এল।

দোকানে কাউন্টারের ওপার থেকে হরনাথ ডাকলেন “মনোহর!”

মনোহর বাবু ঘাড় নাড়লেন “না হক না।”

ধনঞ্জয় রায়ের চেহারা একদম বদলে গেছে।

ধনঞ্জয় রায়কে আমরা মুহূর্ত্তের জন্য দেখেছিলাম। এক সময়ে ধনঞ্জয় ছিল ইন্সপেক্টর রবীন্দ্রনাথের কেরাণী আর আজ নিশাচর দলের কেরাণী, আর্দ্দালি, তাঁবেদার সংবাদ সংগ্রাহক সব। একদিন ইন্সপেক্টর রবীন্দ্রনাথের কেরাণী থাকার জন্য ধনঞ্জয়ের নানা রকম খবর, পুলিশের কার্য্যকলাপ প্রভৃতি জানা থাকায়, ধনঞ্জয় দলের একটা সম্পদ।

আর ধনঞ্জয়ের সে দুস্থ অবস্থাও নেই। সেই খোলার বস্তী সে ছেড়ে দিয়েছে। বড়বাজারের বিরাট বিরাট বাড়ীগুলোর মাড়োয়ারী কলোনীর মধ্যে একপাশে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট নিয়ে সে থাকে।

অবস্থার পরিবর্ত্তন হলে বাতিক আসে। মানুষের কাজ চাই, মানুষ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। ধনঞ্জয় রায়ের এখন প্রধান বাতিক পায়রা পোষা। তার ঘরের পাশে ব্যালকনিটায় একটা কাঠের বেশ বড় গোছের ঘর। ঘরটার অজস্র খুপরীগুলোর মধ্যে নানা রকমের পায়রা। ধনঞ্জয় পায়রাগুলোকে খাওয়ায়, আদর করে—পায়রাগুলো ধনঞ্জয়কে চিনে ফেলেছে। নানা রকমের পায়রা ধনঞ্জয়ের ঘরটায় থাকে—গেরোবাজ, ঘয়লা, কতকি! লাল, সাদা, নীল, কালো। এদের মধ্যে একটা পায়রা ধনঞ্জয়ের বড় প্রিয়। পায়রাটা

আকারে মাঝারী, গায়ের রং কালচে নীল, বুকের কাছটায় অল্প একটু সাদার ছোঁয়াচ। ধনঞ্জয় তাকে আদর করে ডাকে নীলা।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা তার খাটের ওপর ধনঞ্জয় শুয়েছিল। ঘরে তখনও আলো জ্বলেনি। একটা অর্দ্ধ-স্বচ্ছ অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পায়রার দলের ডাক ভেসে আসছিল—বক্ বক্ বক্‌ম্-বক্ বক্।

ধনঞ্জয় খাটের ওপর চোখ বুজে ছিল।

দরজায় একটা মৃদু টোকার শব্দে সে উঠে বসল।

"সজ্ব !" ধনঞ্জয় চাপা গলায় বলল।

বাইরেও শোনা গেল "সজ্ব !"

"একটু দাঁড়াও !" ধনঞ্জয় সাড়া দিল "তৈরী হয়ে নিই।"

মুহূর্ত্তের বেশ পরিবর্ত্তন করে একটা ছদ্মবেশ পরে ফেলল ধনঞ্জয়। এই ছদ্মবেশেই এখানকার সব অধিবাসী ধনঞ্জয়কে জানে। অতিরিক্ত একটা কালো মুখোস চড়িয়ে সে দরজা খুলে দিল।

তেমনি মুখোস আঁটা একটা লোক ঘরে ঢুকে বলল "দশনম্বর রেডী হয়ে নাও। একটা বিশেষ মিটিং ডেকেছে আমাদের এক নম্বর।"

দশ নম্বর ধনঞ্জয় বলল "বেশ তুমি যাও আমি আসছি।"

দরজায় চকচকে পেতলের একটা গোল ধরবার হাতল ছিল। আগন্তুক সেটা ধরে দরজা খুলে চলে গেলে, একটা দস্তনা পরে সাবধানে ধনঞ্জয় হাতলটা প্যাঁচ ঘুরিয়ে খুলে ফেলল তার পরে অন্য আর একটা হাতল সেখানে পরিয়ে দিল। একটু পরে বেরিয়ে গেল ধনঞ্জয়।

পরদিন সন্ধ্যার পোষ্টে তাঁর নামে ব্যাঙ্কে একটা চিঠি আসায় সুরজিত বিস্মিত হোল। তাকে চিঠি লিখবে কে ? আবার কি নিশাচর দল নাকি ? সুরজিত খুলে ফেলল খামখানা—ইংরাজীতে টাইপ করা চিঠি।

"মহাশয়,

আপনাকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে যে আপনি বাড়ীতে জানিয়ে দেবেন যেন আপনার মা বা বোন কোন কারণে কোন দিন বাইরে না যান।

একজন বন্ধু।"

চিঠি পড়ে সুরজিত অবাক। তার মা বা বোন বাড়ীর বাইরে যাবে কেন ? তারাত কোন দিনই বাড়ীর বাইরে যায় না, এক তার সঙ্গে ছাড়া !

চিঠিখানা নিয়ে সুরজিত লালবাজারে চলে এল। সুশীলবাবু চিঠিখানা দেখে বললেন "হুঁ! চিঠিটা

আপনি রেখে যান মিষ্টার বোস। ফিঙ্গার প্রিণ্ট ডিপার্টমেণ্টে পাঠিয়ে দেখি। আর আপনার আঙ্গুলের ছাপটা দিয়ে যানত। আপনি চিঠিটা ধরেছিলেন, ওতে আপনার আঙ্গুলের ছাপ যথেষ্ট আছে। সেগুলো বাদ দিতে হবে কিনা!"

সুরজিত একটু পরে বাড়ীর পথ ধরল আর ফিঙ্গার প্রিণ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে যখন সুশীলবাবু বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর মুখ উত্তেজনায় লাল। একটা ট্যাক্সি ডেকে তিনি একটা বাড়ীর নম্বর বললেন "চালাও জলদি।"

নম্বরটা স্বর্গতঃ ইন্সপেক্টর রবীন্দ্রনাথের বাড়ীর।

এদিকে সুরজিত বাড়ীতে এসে কড়া নাড়ল। বাইরের দরজা বন্ধ, বাড়ীটা কেমন অস্বাভাবিক রকমের স্তব্ধ। একটা অজানা কারণে সুরজিতের গা'টা ছম-ছম করে উঠল।

ভেতর থেকে সাড়া এল "কে?"

"আমি। অণিমা, দরজা খোল।"

"কে দাদা?" অণিমার গলায় একটা অস্বাভাবিকতা।

দরজা খুলেই অণিমা বলল "তুমি......তোমার কিছু হয়নি দাদা?"

"কি হবে কি?"

"মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?"

"তার মানে ?" সুরজিত প্রায় জমে গেল। ততক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটার অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

অণিমা বলল "একটু আগে একটা হাঁসপাতালের তকমা আঁটা একজন লোক এসে বলল তুমি মোটার চাপা পড়েছ। হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তোমাকে। তুমি মাকে দেখতে চেয়েছ। মা আর দেরী না করে ট্যাক্সিতে চেপে বসলেন লোকটার সঙ্গে।"

সুরজিত হতভম্ব হয়ে গেল। "অণিমা, যে কেউ এসে ডাকুক কোনমতে তুই বাড়ী ছেড়ে বেরোবি না। কিম্বা এক কাজ কর তুই ওই ঘোষমাসীর কাছে গিয়ে থাক খানিকক্ষণ! আমার যদি ফিরতে রাত হয় গোবর্দ্ধনকে দিয়ে লালবাজারের সুশীলবাবুর কাছে খবর পাঠাবি।" গোবর্দ্ধন সুরজিতের চাকর।

সুরজিত আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না। ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল সে। মাথায় তার আগুণ ঝলসাচ্ছে, মনে হতাশা।

এইখানে একটা দৃশ্য আমাদের পেছিয়ে যেতে হবে।

ধনঞ্জয় তার ছোট্ট লোহার সিন্দুকটা খুলে তার মধ্যে একটা খাতা ঢুকিয়ে রেখে দিল। সিন্দুকটা

বন্ধ করবার আগে তার মধ্যে কি গোটা কতক করল সে। তারপরে সিন্দুকটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। রোদ পড়ে আসছে। পশ্চিমে একটা কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। একবার ব্যালকনিতে এসে সে নীচে তাকিয়ে দেখল। সহর উগ্র, সহর দুরন্ত! পায়রাগুলোকে একবার আদর করল। তারপরে ঘরে ঢোকবার সময় হঠাৎ ধনঞ্জয় দেখল দরজার নীচে একটা খাম।

ক্ষিপ্র পায়ে এসে সে খামখানা নিয়ে খুলে ফেলল।

"সমস্ত উপদেশগুলো মনে যেন থাকে।

নিশাচর।"

বাংলায় টাইপ করা চিঠি।

ধনঞ্জয় হাসল। এতদিন পর্য্যন্ত দল তার আদেশ উপদেশ স্পষ্ট জানিয়েছে—এই প্রথম অদৃশ্য আদেশ। ধনঞ্জয় ব্যালকনিতে বেরিয়ে এসে তার প্রিয় পায়রা 'নীলা'কে বার করে আনল, তারপরে কি একটা বেঁধে দিল তার পায়ে।

"হয়ত আর দেখা হবে না!" খুব মৃদুস্বরে নীলার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল ধনঞ্জয়।

নীলার উষ্ণ ক্ষুদ্র দেহটা তার হাতের মধ্যে কাঁপছিল।

তারপরে ধীর গতিতে ব্যালকনিতে এসে নীলাকে ছেড়ে দিল ধনঞ্জয়। হাত থেকে ছাড়া পেয়ে প্রথমটা

তার বাসার মাথায় এসে বসলল নীলা। ধনঞ্জয় সমস্ত পায়রার খুপরীগুলোর দরজা খুলে দিল। একঝাঁক পায়রা পতপত করে আকাশে উঠল। আর নীলাও ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই দলে।

সমস্ত পায়রার ঝাঁকটা ঘুরে আকাশে উঠছিল, হঠাৎ দেখা গেল একটা কালচে নীল পায়রা ডিগবাজী খেতে খেতে ঝাঁক ছাড়িয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। পড়ন্ত সূর্য্যের রশ্মিতে তার বুকের ওপর একটা রূপোলী রেখা চকচক করছে। খানিকটা ওপরে উঠে পায়রাটা তির্য্যক গতিতে হঠাৎ দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে একটা বাঁক নিল আর দেখতে দেখতে একটা বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল।

ধনঞ্জয় সেদিকে চেয়ে একটা ম্লান হাসি হাসল তারপরে ভেতরে এসে ক্ষিপ্র গতিতে তার সাধারণ ছদ্মবেশ পরে নিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তাকে দেখা গেল যে সে সুরজিতের বাড়ীর আশে পাশে পায়চারী করছে।

এদিকে বাড়ী থেকে পাগলের মত প্রথমটা ছুটে বেরিয়ে এসে সুরজিত ভাবল কি করবে সে? প্রথমটা একটা ভয়ঙ্কর অস্থিরতা তাকে পাগল করে তুলেছিল।

গাড়ীর ওধারে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে সেই কানা ভিখিরিটা!

ধনঞ্জয়ের মুখ থেকে সভয়ে সবিস্ময়ে বার হোল—"এক নম্বর?"

ভিখিরিটা হেসে উঠল। মুহূর্ত্তের মধ্যে পাঁচটা লোক যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে সুরজিত আর ধনঞ্জয়কে নিরস্ত্র করে ফেলল। তারপরে তারা ছুটো বলির পাঁঠার মত ধনঞ্জয়ের গাড়ীতেই উঠতে বাধ্য হোল।

দলের বিচার

ধনঞ্জয়ের ফ্ল্যাটটা তিনতলার এক কোণে। দিনের বেলাই সেখানটা বেশ অন্ধকার, রাতের ত কথাই নেই! সিঁড়ির ওপর একটা মিটমিট করে কম পাওয়ারের বাতী জ্বলছে—অন্ধকার তাতে আরও প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে যেন। একটা লোক নিঃশব্দে এসে ধনঞ্জয়ের দরজার সামনে দাঁড়াল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার এদিক ওদিক তাকাল সে, তারপরে পকেট থেকে একটা সরু তারের মত যন্ত্র বার করে দরজার চাবীর গর্ত্তে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। দরজাটা খুলতেই একদল পায়রার ডাক তার কাণে ভেসে এল।

লোকটা ঘরে ঢুকে একটা টর্চ্চ জ্বেলে এদিক ওদিক তাকাল একবার। দেওয়ালের কোলে সিন্ধুকটা তার নজরে পড়ল। লোকটা ক্ষিপ্রগতিতে সিন্ধুকটার কাছে এগিয়ে গেল। তার যন্ত্রটা দিয়ে সিন্ধুকটার চাবীটা ঘোরাতে তার একমিনিটও লাগল না। সিন্ধুকের ভেতরে চাবীটা খুলে যাওয়ার একটা শব্দ হোল ক্লিক্! লোকটা

একটা ক্রুর হাসি হাসল। তারপরে সিন্ধুকের ডালাটা ধরে টান দিল।

অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল সেই সময়। সিন্দুকটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধুকের মধ্যে থেকে একরাশ তীব্র ধোঁয়া পাকিয়ে উঠে মুহূর্ত্তের মধ্যে লোকটার নাক মুখ ভরিয়ে দিল। লোকটা কাশতে সুরু করল, সিন্ধুকের ডালাটা তার হাতের ঠেলা খেয়ে দেওয়ালে গিয়ে লাগল। দেওয়ালে একটা ছোট্ট বোতাম ছিল। সিন্ধুকের ডালাটা সেখানে লাগবা মাত্র ধনঞ্জয়ের ঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। আর লোকটা তখন দাঁড়িয়ে প্রাণপণে দম নেবার চেষ্টা করছে। একটা মুহূর্ত্ত। লোকটা একবার সজোরে কেশে উঠল। চোখ দুটো তার বড় বড় হয়ে গেল, পরমুহূর্ত্তে জ্ঞান হারিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল সে

গাড়ীতে তুলে সুরজিতের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। মিটীং রুমে নিয়ে এসে তার চোখ খুলে দেওয়া হোল।

সুরজিত সবিস্ময়ে নিশাচর দলের সম্পূর্ণতা লক্ষ্য করল। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড টেবিলটায় সার সার সতেরো জন লোক বসে আছে। প্রত্যেকের মুখে নম্বর আঁটা কালো মুখোস।

এক নম্বর বললেন "বস্থন স্থরজিত বাবু।"

স্থরজিত একটা চেয়ারে বসল।

"দশ নম্বর তুমিও বসতে পার।"

ছুজন করে ষণ্ডা মার্কা লোক স্থরজিত আর ধনঞ্জয়ের পাশে এসে দাঁড়াল। এক নম্বর তার কৌচে গিয়ে বসে বললেন "ভদ্র মহোদয়গণ, সভার কাজ স্থরু করা যাক। আপনারা জানেন আগের একটা সভায় আমি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলাম যে সেই ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ারটার একটা স্থরাহা আমি করব। আমার প্রতিশ্রুতি আমি রেখেছি। সে আজ আপনাদের সামনে—যদিও সে এখন কেসিয়ার নয়, স্পেশাল গার্ড।"

এক নম্বরের গলায় শ্লেষ।

সভায় একটা গুঞ্জন উঠল।

"ভদ্র মহোদয়গণ 'নিশাচর' দলের বিরুদ্ধে স্পেশালই হোক বা অর্ডিনারিই হোক গার্ড কি করবে? তবু ওর জন্তে আমাদের ছ নম্বরকে হত্যা করতে হয়েছে। ওর প্রতি আপনাদের রায় কি?"

সভা থেকে এক বাক্যে প্রতিধ্বনিত হোল—'মৃত্যু'! স্থরজিত হাসল। তেমনি শ্লেষভরা ভদ্রগলায় সে বলল "ভদ্র মহোদয়গণ আপনাদের ধন্তবাদ! কিন্তু সভাপতি মহাশয় আমার মায়ের কি হবে জানতে পারি কি? তিনিত আপনাদের বিরুদ্ধে কিছু অপরাধ করেন নি!".

"হুঁ!" সভাপতি বললেন "ভদ্র মহোদয়গণ আপনাদের অভিমত কি?"

"তিনি ছাড়া পেলে" একজন প্রশ্ন করল "আমাদের বিরুদ্ধে........"

এক নম্বর হেসে বললেন "জিগেস করছেন কোনরকম সাক্ষ্য দিতে পারবেন কিনা? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"তা হলে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে।"

"বেশ!"

সুরজিত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

এক নম্বর গলা নামিয়ে বললেন "ভদ্র মহোদয়গণ এইটা আজ আমাদের সভার বিষয় ছিল কিন্তু আর একটা ব্যাপার ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। আজ এই সভায় তারও নিস্পত্তি হয়ে যাবে। এই দলে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে।"

সভার গুঞ্জন অকস্মাৎ থেমে গেল। দলের সকলেই একটু নড়ে চড়ে বসল—যেন সকলেই সকলের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ।

এক নম্বর বলে চললেন "আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন মুখোসধারীদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক কেউ নয়।"

দল যেন একসাথে নিঃশ্বাস ছাড়ল।

"ভদ্র মহোদয়গণ আমি দেখছি এই দলে দশ

সংখ্যাটা অপয়া। এবারেও দশ নম্বর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আপনারা জানেন দশ নম্বরের দেওয়া প্রত্যেকটি লুঠের ব্যাপারে আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম। সেই থেকে দশ নম্বরের ওপরে আমি লক্ষ্য রাখি। আজ তাকে হাতে হাতে ধরেছি—ওই কেসিয়ারটাকে নিয়ে সে পালাবার চেষ্টা করছিল।"

একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল "সভাপতিমশাই আপনার বুদ্ধি এবং চোখকে দলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ।"

এক নম্বর হাসলেন "আপনারা কখনও কাউকে দেখেন নি কিন্তু যে আর উপকার অপকারের বাইরে যেতে বসেছে তাকে দেখতে দোষ নেই। ওই যে মুখোসহীন লোকটা সম্বন্ধে আপনারা বিস্মিত বোধ করছিলেন—ওই সেই হতভাগ্য দশ নম্বর।"

সমস্ত চোখের ক্রুর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ধনঞ্জয়ের ওপর। মনে হোল ধনঞ্জয় কাঁপছে। ধীর গলায় সে বলল "সভাপতি মশাই আমি এক গেলাস জল পেতে পারি ?"

এক নম্বর হাসল "এক গেলাস নয় দশ নম্বর এক পেট ! যত পার জল তুমি খাবে—জল থেকে উঠবেনা আর।"

সভা নিঃশ্বাস টানল।

"ভদ্র মহোদয়গণ বিশ্বাসঘাতক সম্বন্ধে আপনাদের বিচার কি ?"

একজন জবাব দিল "আপনার বিচারে আমাদের বিশ্বাস আছে।"

"তাহলে নিশ্চিন্ত থাকুন! মৃত্যুত সহজ দশ নম্বর সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা করব যে মরণের পরও তার মনে থাকবে।"

এই সময়ে একজন বলে উঠল "কিন্তু সভাপতি মশাই আগে জানা দরকার যে দশ নম্বর দলের কোন অপকার কিছু করেছে কিনা। সে বিষয়ে আগে থেকে সাবধান্ হতে হবে।"

দল ঘাড় নাড়ল "ঠিক ঠিক!"

এক নম্বর ডাকলেন "আট এবং ন' নম্বর তোমরা দশ নম্বরের ওপর পাহারায় ছিলে। ও কোন রকম খবর দিয়েছে পুলিশে?"

"না।"

"ওর ঘরে টেলিফোন ছিল?"

"না।"

"সব সময়ে তোমরা ওকে অনুসরণ করেছ?"

"হ্যাঁ।"

"দশ নম্বর উঠে এস।"

ধনঞ্জয়কে ধরে নিয়ে এক নম্বরের সাম্নে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হোল।

"হাত দুটো বেঁধে দাও ওর।"

"হুঁ ! এইবার দশ নম্বর তোমাকে প্রশ্ন করছি এই দলের বিরুদ্ধে তুমি কোন রকম কিছু করেছ ? মনে থাকে সত্যি কথা বললে তোমার প্রতি আমরা দয়া দেখাতে পারি।"

"কি দয়া ?"

"তোমাকে আমরা সহজ মৃত্যুর সুযোগ দেব।"

সুরজিত হেসে উঠল "কি দয়া !"

ধনঞ্জয় বলল "আর যদি না বলি !"

"জ্যান্ত পোড়ান জান ?"

এক নম্বরের গলার স্বর আর মুখোসের ভেতর দিয়ে চোখ দুটো দেখে সুরজিত শিউরে উঠল। ধনঞ্জয় অনেক-ক্ষণ চুপ করে' রইল।

"কি ঠিক করলে ?"

"সহজ মৃত্যুটাই অনেক ভাল।"

"বেশ ! বল তাহলে দলের বিরুদ্ধে কিছু করেছ ?"

"হ্যাঁ !"

সমস্ত সভা নিস্তব্ধ !

"কি করেছ ?"

"আমি দলের প্রত্যেক সভ্যের নাম ধাম ঠিকানা মায় আঙুলের ছাপ শুদ্ধ যোগাড় করেছি।"

সমস্ত সভায় একটা সভয় নিঃশ্বাস টানার শব্দ শোনা গেল। শুধু এক নম্বর স্থির।

"কোথায় সে সব ?"

ধনঞ্জয় এক মুহূর্ত্ত বেশী নিস্তব্ধ ছিল। সভ্য একজন লাফিয়ে উঠল "সভাপতি মশাই একটা যা হয় করুন! এ বিপদ মাথায় নিয়ে চুপ করে থাকা যায় না।"

এক নম্বর পিস্তল তুলে ধনঞ্জয়ের বুকে লক্ষ্য করলেন।

ধনঞ্জয় হাসল "ওটা সহজ মরণ সভাপতি মশাই! আমার ওটার ওপর লোভ লাগতে পারে।"

"বল শিগ্‌গির!"

"এক গেলাস জল দিতে বলুন আগে।"

একজন উঠে জল এনে দিল।

"হাতে বড় লাগছে। বাঁধনটা আল্‌গা করে দিন!"

দাঁতে দাঁত চেপে এক নম্বর বললেন "হাত ভেঙ্গে ফেলব এখুনি—বল শিগ্‌গির!"

ধনঞ্জয় বলল "আমার সিন্দুকে একটা খাতার মধ্যে সে সব আছে।"

একজন লাফিয়ে উঠল "সভাপতি মশাই ?"

এক নম্বর হাসলেন "আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি আগেই দু নম্বরকে ওর ঘরে পাঠিয়েছি। কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে যে দলকে এমন একটা ওস্তাদ লোক হারাতে হবে যে নিশাচর দলের ওপরেও টেক্কা দিতে পারে। হ্যাঁ ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয়ই তোমার নাম ত ?"

"না।"

"হুঁ! আমি ভেবেছিলাম। তোমার নাম কি?"

"রবীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী!"

"ইন্সপেক্টর রবীন্দ্রনাথ?" ঘরে একটা আর্ত্তনাদ। বজ্রপাত হলেও সকলে এমনভাবে ভীত আর্ত্তনাদ করে উঠত না।

এক নম্বর দাঁড়িয়ে উঠলেন "স্থির হোন! স্থির হোন আপনারা। ভয় কিসের? ইন্সপেক্টর এখন আমাদের হাতে। একমুহূর্ত্তে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু শেষ হয়ে যাবে। ভয় কি? দু নম্বর এসে পৌছালেই সে খাতাখানাও আমাদের হাতে তার পরে আবার দল আরও বড় রকমে তাদের কাজ সুরু করবে। কিন্তু একটা কথা ইন্সপেক্টর রবীন্দ্রনাথত মারা গিয়েছিলেন।"

ধনঞ্জয় বা রবীনবাবু হাসলেন "না। মারা গিয়েছিল ধনঞ্জয়। সেই সুবিধাটুকু নিয়ে ধনঞ্জয়ের ভূমিকা আমি অভিনয় করেছি একেবারে ঘর বাড়ী ছেড়ে তার চলন বলন, তার জীবনী কাঁটায় কাঁটায় আমাকে আয়ত্ব করতে হয়েছে।"

"হুঁ!" এক নম্বরের স্বরে প্রশংসা।

দলের একজন সভ্য বলে উঠল "কিন্তু দু নম্বর এখনও আসছেন না কেন?"

ধনঞ্জয়—এখন আমরা রবীনবাবুই বলব—বললেন "দু নম্বর আর না আসতেও পারে।"

"তার মানে ?" এক নম্বর লাফিয়ে উঠলেন। সেই প্রথম তাঁর গলায় ভয়ের আভাস পাওয়া গেল। রবীন বাবু বললেন "এমন হতে পারে যে দু নম্বর আমার সিন্দুকটা খোলা মাত্র তার ভেতরের একটা গ্যাসে অজ্ঞান হয়ে পড়বেন।"

সুরজিত সবিস্ময়ে রবীনবাবুর মুখের দিকে তাকাল। লোকটা অদ্ভুতকর্ম্মা !

দুজন সভ্য লাফিয়ে উঠছিল, এক নম্বর বললেন "না আপনারা বসুন! আমি নিজে যাব। দলের সকলেই ভুল করেছে। আর ভুল আমি হতে দিতে পারি না। আমার অনুপস্থিতে তিন নম্বর প্রেসিডিণ্টের চেয়ারে বসবেন।

এক নম্বর বেরিয়ে চলে গেলেন।

সময় কেটে চলেছে—প্রতিটি মুহূর্ত্ত ভয়ঙ্কর! মৃত্যুর মুখোমুখী বসে থাকা যে কি সুরজিত সেটা অনুভব করল। রবীনবাবু স্থির নিথর। সুরজিত তাঁর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত না হয়ে পারলনা আর পুলিশের ওপরেও শ্রদ্ধা তার শতগুণ বেড়ে গেল। এরকম ভাবে কাজের জন্য আত্ম-বলিদান বোধহয় পুলিশই পারে। রবীনবাবু কি না করেছেন? বাড়ী ঘর, নাম সম্মান সব পরিত্যাগ

করে, প্রতিমুহূর্ত্ত মরণকে মাথার ওপর নিয়ে ডাকাতের দলের বিরুদ্ধে তিনি তার সাক্ষ্য, সূত্র যোগাড় করেছেন। তবু শেষ রক্ষা হোল না। এখনই দু নম্বরকে নিয়ে এসে পড়বে এক নম্বর। তারপর সব শেষ।

ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সভাপতি তিন নম্বরের গলা শোনা গেল "বড় দেরী হচ্ছে, এক নম্বর কি··· ?

রবীনবাবু শ্লেষভরা গলায় বললেন "এক নম্বর আপনাদের কাঁচা লোক নন !"

"চুপ করে থাক !" সভাপতি বললেন "জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব।"

রবীনবাবু হাসলেন কিন্তু তাঁর মুখে যেন একটা উদ্বেগ ! যেন সমস্ত একাগ্রতা দিয়ে তিনি কি একটার অপেক্ষা করছিলেন—সে আশা ব্যর্থ হয়ে গেল।

ঠিক সেই সময় সভাপতির কৌচের পাশের লাল আলোটা জ্বলে উঠল—বাইরে শোনা গেল—"একতা" !

সুরজিতের মুখ পাংশু হয়ে গেল, রবীনবাবুর চোখ উজ্জ্বল। সভাপতি লাফিয়ে উঠলেন "দু নম্বরের গলা না ?'

দল বলে উঠল "হ্যাঁ হ্যাঁ !"

"এক নম্বর কোথায় ?"

বাইরে আবার শোনা গেল "একতা !"

সভাপতি রবীন বাবুর দিকে চেয়ে বললেন "ধাপ্পা দিতে চেয়েছিলে ?"

"না। ছুনম্বর বোধ হয় ফাঁদে পা দেয়নি।"

সভাপতি হেসে দরজা খোলার বোতামটা টিপলেন। আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেল। দরজার সমনে দেখা গেল ছুনম্বরের মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটা কিছু না বলে ঘরে এগিয়ে এল, চলাটা আড়ষ্ট।

সভাপতি বলতে যাচ্ছিলেন "ছুনম্বর......" তাঁর কথা শেষ হোল না ছুনম্বরের ছদ্মবেশের মধ্যে থেকে জলদ গম্ভীর স্বর শোনা গেল "কেউ নড়বেনা খবরদার......।"

এক টানে ছদ্মবেশ খুলে গেল। বক্তা পিস্তল হাতে সুশীল বাবু। পিল পিল করে মুহূর্ত্তের মধ্যে সাদা পোষাকে পুলিশ ঢুকে দলটাকে ঘিরে ফেলল।

সুশীলবাবু বলছিলেন "আপনার জন্য আমাদের কম ভাবনা হয়নি সুরজিত বাবু। আপনার বোন খবর পাঠিয়েছিল।"

রবীন বাবু বললেন "ওহে সুশীল আমার বাঁধনটা খোল।"

সুশীল বাবু হেসে বললেন "আপনার একটু সাজা হওয়া দরকার রবীন বাবু। আমাদের শুদ্ধ আপনি ধাপ্পা দিয়েছিলেন। সবাই ভেবেছি আপনাকে আমরা হারিয়েছি।"

"কোন কাজ করতে হলে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে করতে হয়। বিশেষতঃ পুলিশের গতি বিধি কার্য্য কলাপের ওপর একনম্বরের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তোমরা জানলে তারও মনে সন্দেহ থাকত, এমন ভাবে আমি কাজ গুছতে পারতাম না।"

"কিন্তু আমার সন্দেহ হয়েছিল।"

"জানি। সুরজিত বাবুকে আমার লেখা চিঠিটা থেকেত?"

"হ্যাঁ যেটাতে আপনি ওঁরা মা বা বোনকে বাড়ী থেকে বেরোতে বারণ করেছিলেন। তাতে আপনার আঙ্গুলের ছাপ ছিল।"

"সেটা আমি ইচ্ছে করে তোমাদের তৈরী করবার জন্যে দিয়েছিলাম। আমার পায়রা গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ! চমৎকার বুদ্ধি করেছিলেন। তার পায়ে বাঁধা চিঠিটা থেকেইত আমরা আপনার ঘরে দুনম্বরকে গ্রেপ্তার করি। তারপরে আপনার উপদেশ মত এ বাড়ী ঘেরাও করে ঢুকি।"

"কিন্তু" রবীনবাবু বললেন "শুধু দুনম্বরকে গ্রেপ্তার করেছ?"

"হ্যাঁ কেন?"

"এক নম্বরকে পাওনি?"

"কই না।"

"সর্ব্বনাশ ! সেই এই দলের মাথা। সেই সব। সে পালালে এত কাণ্ড করা সব ব্যর্থ। সে বুঝে ফেলেছে সব শেষ তাই ছুনম্বরকে আনতে যাবার নাম করে চম্পট, ...শিগ্‌গির সুশীল। এদের চালান করে কয়েকজন লোক নিয়ে এস।"

"লোক যা আছে এদের সঙ্গে লাগবে।"

"আচ্ছা আচ্ছা তুমি আমি আর সুরজিতবাবু হলেই হবে—এস !"

সুরজিত বলল "আমার মা ?"

"আপনার মা ভাল আছেন ভাববেন না।"

এক নম্বর

রাত নটা বাজে। বড় বাজারে দত্ত দাস কোম্পানীর দোকান যদিও সাধারণতঃ তখন বন্ধ করবার সময় নয় তবু দোকানটা সেদিন ফাঁকা। দরজা তখনও বন্ধ হয়নি বটে এবং দোকানের মধ্যে কাউন্টারের ওপর মিটমিট করে একটা আলো জ্বলছিল। কাউন্টারের ওপারে একজন লোক ব্যস্ত হয়ে কি করছিল।

রবীনবাবু, সুরজিত আর সুশীলবাবু দোকানে ঢুকলেন। সুশীলবাবু লোকটাকে জিগেস করলেন "দোকানের মালিক কোথায়?"

লোকটা মাথা তুলল। তার বয়স ষাট পার হয়ে গেছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ী চুলে পাক ধরেছে, আধ-ময়লা পোষাক। লোকটা খক খক করে কাশল, মেঝেয় থুতু ফেলল এক থাবড়া তারপরে বলল "কাকে? মনোহর বাবুকে খুঁজছেন?"

লোকটার গলা ভাঙ্গা, স্বর যেন ফাটা হাঁড়ীর মধ্যে থেকে বেরোচ্ছে।

সুশীলবাবু বললেন "হ্যাঁ!"

"তিনি ত চলে গেছেন।"

সুশীলবাবু, রবীনবাবুর মুখের দিকে তাকালেন।

রবীনবাবু জিগেস করলেন "দোকানের আর সকলে কোথায়?"

"তাঁদের ছুটী দিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

"তার মানে?"

"বলেন কেন? কর্ত্তাদের মর্জ্জী, দোকান তুলে দেওয়া হবে। আমি খতেন ঠিক করছি। যার যা পাওনা দিয়ে দেওয়া হবে।"

রবীনবাবু নিরাশ গলায় বললেন "যা ভেবেছিলাম সুশীল! আমাদের দেরী হয়ে গেছে! এক নম্বর সহজ লোক নয়। হায় হায় এত কাণ্ড করেও শেষ রাখা গেল না? চল শিগ্‌গির! তার চেহারার একটা হুলিয়া বার করে দিতে হবে। তাঁরা পথে বেরিয়ে এলেন।

সুশীলবাবু জিগেস করলেন "তার মানে, রবীনবাবু, এক নম্বর কে?"

"ওই মনোহর দাস, দত্ত দাস এণ্ড কোম্পানীর মালিক।"

সুরজিত সবিস্ময়ে বলে উঠল "অ্যাঁ! অমন অমায়িক শান্ত লোক?"

"হ্যাঁ, মনোহর পাকা অভিনেতা, আর দুনম্বর হোল,

ওর অংশীদার হরনাথ দত্ত। ওর ওই মিষ্টি ভদ্র ব্যবহারে ও সকলকে ঠকিয়েছে। মনোহর এক সময়ে বাংলা দেশের এক প্রসিদ্ধ অভিনেতা ছিল।"

হঠাৎ রবীনবাবু থমকে দাঁড়ালেন "ওঃ! শিগ্‌গির সুশীল! দত্ত দাসের দোকানের লোকটার কি রকম ভাঙ্গা গলা লক্ষ্য করেছ?"

"হ্যাঁ কেশো রুগী! কিন্তু........"

"ছোট ছোট আর কথা নয়।"

তাঁরা হাঁফাতে হাঁফাতে দত্ত দাস এণ্ড কোম্পানীর দোকানের সামনে এসে পৌঁছালেন। তখন সব আলো দোকানের নিভে গেছে। বাইরের কোল্যাপ্সিব্‌ল্ লোহার গেটটায় সেই লোকটা তালা মারছিল, পাশে একটা ছোট থলি। রবীনবাবু নিশব্দে এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে একটা হাত রাখলেন "মনোহর দাস, নিশাচর দলের দলপতি এক নম্বর হিসাবে আমি তোমায় গ্রেপ্তার করছি........."

রবীনবাবুর কথা শেষ হোল না.........বিদ্যুতের মত তিনি এক পাশে লাফ মারলেন.........পিস্তলের চাপা আওয়াজ হোল......প্লপ্ প্লপ্......রবীনবাবুর ডান হাতের মধ্যটা সবেগে শূন্যে একটা রেখা কেটে মনোহর দাসের চোয়ালে গিয়ে লাগল।

পিস্তলের মুখ থেকে নিজকে বাঁচিয়ে এবং সঙ্গে স-

আক্রমণ কারীকে সেই অসম্ভব ব্লোখানা মারার বিজ্ঞান-টুকু লক্ষ্য করে সুরজিতের চোখ তখন কপালে উঠেছে। মনোহর দাস ঘুরে গিয়ে পড়ে গেল, পিস্তলটা ছিটকে পড়ল হাত থেকে সঙ্গে সঙ্গে সুশীলবাবু মনোহরের ওপর ঝাঁপ দিলেন। পরমুহূর্ত্তে বিস্ময়কর ঘটনা। ওই ব্লো খেয়ে কেউ দাঁড়াতে পারে? কিন্তু পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনোহর দাস যেন মাছের মত পিছলে উঠল এবং একটা অদ্ভুত ভাবে হাত পা সঞ্চালন করল সে। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া সুশীলবাবু তিন হাত দূরে ছিটকে পড়লেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘুরে মনোহর বিদ্যুতের মত ছুট দিল।

সুরজিত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। রবীনবাবু তার পেছু নিতে নিতে চেঁচিয়ে উঠলেন "থলিটা তুলে নিন সুরজিত বাবু!"

সুশীলবাবু লাফিয়ে উঠে হুইশ্লে ফুঁ দিলেন। দূরে মনোহরের পেছনে রবীনবাবু মিলিয়ে যাচ্ছেন। হুইশ্লে ফুঁ দিতে দিতে সুশীলবাবু পেছু নিলেন। সুরজিতও তাঁর পেছনে।

সামনে একটা বাস। মাছের মত পাশ কাটাল মনোহর। তার পরে হাওড়ার পোল—লোকেরা থমকে দাঁড়িয়েছে। সুশীলবাবু আর রবীনবাবু চেঁচাচ্ছেন—পাকড়ো......পাকড়ো!

একদল পুলিশ দৌড়ে আসছে। আর যাবে

কোথায় ? হাওড়া পোলের ওদিকেও সামনে পুলিশ। এইবার মধ্যিখানে মনোহর বেড়া জালে পড়ে গেছে।

সুশীলবাবু হাওড়ার পোলের ওপর পুলিশগুলোর উদ্দেশে হাঁক দিয়ে উঠলেন !

সুরজিত দেখল—একটি বার মনোহর থমকে দাঁড়াল, রবীনবাবু তখন প্রায় তাকে ধরে ফেলেছেন। তারপরে যেন একটা শুক্ !

একলাফে মনোহর রেলিংয়ের ওপর লাফিয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে নীচের কালো জলের পানে চেয়ে শূন্যে ঝাঁপ দিল। সমস্ত ব্যপারটা বিদ্যুতের মত গেল ঘটে। কালো অন্ধকার আর কালো জল গ্রাস করে নিল তাকে।

জলপুলিশকে খবর দিতে সুশীলবাবু রয়ে গেলেন। রবীনবাবু আর সুরজিত ফিরলেন। সুরজিতের প্রশ্নের উত্তরে রবীনবাবু বলছিলেন "......হ্যাঁ, সাধারণ আসামীর পালাবার অনুভূতিটাই বড় কিন্তু আমাদের এক নম্বর সাধারণ লোক নয়। ওর ওই মস্তিষ্ক কোন ভাল কাজে দিতে পারলে জগতের হয়ত অনেক উপকার হোত। প্রথমে ও আমাকেও ঠকিয়েছিল। ও যখন বুঝল যে দলের আর কোন আশা নেই ও পালিয়ে এল দোকানে। ও জানত পুলিশ দোকানে আসবে কিন্তু ও চাল চালল

সেইটাই তখন ওর একমাত্র আশা। ও পালাল না ছদ্মবেশে আমাদের ধাপ্পা দেবে স্থির করল। তা ছাড়া দোকানের অজস্র সোনা হীরে জহরৎ গুলো আত্মসাৎ করতে হবে—তাতে সময় নেবে। ধাপ্পা দিয়েও ছিল—কিন্তু গলাটা অতিরিক্ত ভাঙ্গতে গিয়ে আমার মনে সন্দেহ জাগিয়ে দিল।"

"ও!" সুরজিত বলল "তাই বুঝি আপনার সন্দেহ হয়েছিল?"

"হ্যাঁ! কিন্তু শুধু তাই নয়। ওর বৈশিষ্টও। এরকম একটা ব্যপার শুধু এক নম্বরের দ্বারাই সম্ভব! আমি যথেষ্ট দিন ওর কাছে থেকে ওর মনস্তত্ত আয়ত্ব করেছি!"

সুরজিত জিগেস করল "কিন্তু এক নম্বর ত কাঁচা লোক নয়, আপনি ওর পরিচয় আবিস্কার করলেন কি করে?"

রবীনবাবু হাসলেন "প্রত্যেক বড় অপরাধীর একটা বড় ভুল হয় সুরজিত বাবু। মনোহরের দোষ হয়েছিল সে পুলিশকে তাচ্ছিল্য করে বোকা ভেবেছিল। শত্রুকে কখনও ছোট ভাবতে নেই! তাছাড়া পুলিশই দেশের সবচেয়ে বড় অরগ্যানিজেশন! আমি এক নম্বরকে আবিস্কার করি অত্যন্ত একটা সহজ ব্যাপারে। আপনি ? নেন দত্ত দাস এণ্ড কোম্পানীর দুপাশের দুটো দোকান

লুঠ হয় অথচ দত্ত দাস কোম্পানীতে হাজার হাজার টাকার কারবার চলছে—সেখানে কিছুই হয় না। ওইটাই আমার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। তদন্ত করতে সুরু করি চুপি চুপি। তারপরে দু নম্বরের সেই বিলাসিতা প্রিয়তা। সর্ব্বদা তার বুকের সেই সোনার কারুকাজ করা ঘড়ির চেনটা মনোহরের অংশীদার হরনাথের দিকে আমার দৃষ্টি টানে। আস্তে আস্তে সব বেরিয়ে পড়ে। আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম কারণ এ দলের বিরুদ্ধে পুলিশই ঠিক উপযুক্ত অরগ্যানিজেশন। প্রাইভেট লোককে বাঁচানই পুলিশের কর্ত্তব্য বিপদে ডাকিয়ে আনা নয়। তবু আপনার বুদ্ধি এবং সাহসকে প্রশংসা করতে হয়।"

সুরজিত বলল "আপনার তুলনায় আমি শিশু রবীন বাবু। আপনার আত্মত্যাগও আশ্চর্য্য !"

রবীনবাবু হেসে বলেন "জানবেন সুরজিত বাবু, অপরাধ শেষ পর্য্যন্ত লাভজনক হয় না। মানুষের সমষ্টিগত মতবাদ শান্তি চায়, চায় নীতি। সততাই সবচেয়ে উন্নতির বড় পন্থা।"

এমনি করে একটা ভয়ঙ্কর দলের পরিসমাপ্তি। ব্যক্তিগত লোভ জীবনে শান্তি আনেনা। অপরাধ চি-

দিনই ঘৃণ্য। মানুষ সহ্য করেনা তাকে। সেইখানেই মনোহরের মত একটা তীক্ষ্ণ মস্তিস্কের ভুল হয়েছিল। এবং সেই জন্যই অকালে বুদ্বুদের মত তাকে মিলিয়ে যেতে হোল।

জল পুলিশ কিন্তু মনোহরের দেহ পায়নি। গঙ্গা-গর্ভেই তার চিরবিসর্জ্জন কিনা সেটা রহস্যই রয়ে গেল।

"শঙ্খ-পদ্ম"

গোপন সংখ্যার প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী।

১। প্রত্যেক কুপনে ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত সংখ্যা দেওয়া আছে। এবং ইহার মধ্যে দুটী সংখ্যা শীলমোহর করা এসোসিয়েটেড্ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক হেড্ অফিসে জমা আছে। প্রতিযোগীগণকে ১ হইতে ১০ এর মধ্যে দুইটী সংখ্যা 'শঙ্খ-পদ্ম' অফিসে পাঠাইতে হইবে। (যেমন ধর প্রথম সংখ্যা ১ ও দ্বিতীয় সংখ্যা ৫ লুকানো আছে তোমরা যদি প্রথম সংখ্যা ১ ও দ্বিতীয় সংখ্যা ৫ দাও তাহা হইলে প্রথম পুরস্কার পাইবে। আর যদি একটা সংখ্যা ১ কিংবা ৫ এর মধ্যে একটী সংখ্যা ঠিক হয় তবে দ্বিতীয় পুরস্কার পাইবে)।

২। যার সমাধান ঐ গোপন সংখ্যা দুটীর সঙ্গে অবিকল মিলিবে সে প্রথম পুরস্কার ৭০৲ টাকা পাইবে। এবং যার যে কোন একটী সংখ্যা মিলিবে সে দ্বিতীয় পুরস্কার ৩০৲ টাকা পাইবে। প্রথমই হোক বা দ্বিতীয়ই হোক একের অধিক মিলিলে পুরস্কার উঁহাদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। কাহার যদি সম্পূর্ণ নির্ভুল না হয় তাহা হইলে যাহাদের একটী সংখ্যা মিলিবে তাহাদের মধ্যে ঐ ১০০৲ টাকা সমান ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

৩। 'শঙ্খ-পদ্ম' প্রকাশিত কুপনেই প্রত্যেক সমাধান পাঠাইতে হইবে। অন্যত্র লিখিত সমাধান গ্রাহ্য হইবে না। প্রতি সংখ্যা ইংরাজী মাসের ১লা বাহির হইবে ও সেই মাসের শেষ তারিখের

মধ্যে কুপন ভর্ত্তি করিয়া পাঠাইতে হইবে। যদি কোন মাসের সংখ্যা কোন কারণ বশতঃ বাহির না হয় প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিবে ও পুরস্কার বন্ধ হইবে না।

৪। কুপনের সংখ্যাগুলি পষ্ট করিয়া কালি দিয়া লিখিতে হইবে ও খামের ওপর "শঙ্খ-পদ্ম" নাম দিয়া সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। যদি কোন সমাধান খাম রেজেষ্টারী করিয়া না পাঠাও তো, ডাক ঘরে খোয়া গেলে অথবা পাঠাইতে দেরী হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৫। প্রতিযোগিতা সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চরম বলিয়া গণ্য ও আইনতঃ বাধ্য হইবে।

৬। পুরস্কার প্রাপ্তিদের নাম "শঙ্খ-পদ্ম" বইয়েই বাহির হইবে। উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাইলে দুইদিন বাদে জানাইয়া দিতে পারি।

প্রথম সংখ্যা ———— দ্বিতীয় সংখ্যা ————

নাম ————————————

ঠিকানা ————————————

"শঙ্খ-পদ্ম"

১১ বি, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড,

পোঃ এলগিন রোড, ভবানীপুর,

কলিকাতা।

(এই কুপনখানি ভর্ত্তি করিয়া পাঠাইবে।)

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০,

প্রথম সংখ্যা ———— দ্বিতীয় সংখ্যা ————

নাম ————————————————

ঠিকানা ————————————————

যদি কোন মাসিক পত্রিকার
গ্রাহক থাকত উহার

নাম ————————————

গ্রাহক নং ————

GHOSE & GUPTA